টেনশন

– চঞ্চল শাহরিয়ার

মিলিকে নিয়ে পালিয়েছি!

মোবাইলে খবর পেলাম এলাকায় তোলপাড়। স্কুল, কলেজ, চায়ের দোকান, মোড়ের আড্ডা সবখানে আমাদের নিয়ে মুখরোচক আলাপ। শাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত মানুষ একটু রঙ চড়ানো গল্পের সুযোগ পেলো। তিলকে তাল বানিয়ে মফস্বল শহর সরগরম হলো।

ওকে নিয়ে সরাসরি কক্সবাজার। কাজি অফিসে বিয়ের ব্যবস্থা করে আকাশ। প্রিয় বন্ধু এই বিপদে আরো বেশি প্রিয় হলো।

মিলির মুখে কোনো কথা নেই। পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হয় তো সে হতবাক অথবা মনে মনে অন্য প্ল্যান আটছে। আমি বুঝতে পারছি না। ওর চাল-চলন, চোখের চাহনি সবই স্বাভাবিক। তখনো পর্যন্ত আমার কথার মুখ ফুটে কোনো উত্তর দেয়নি। সব ইশারায় চলছে, মাথা নেড়ে, ঘাড় কাত করে।

কাজি অফিস থেকে বেরিয়ে কাবিননামা পকেটে পুরে সোজা *লাবণী মোটেলে*। আকাশ আগাম সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

এখন দুপুর। সমুদ্র স্নানের কামানায় আমি ব্যাকুল। প্রেমিকা এখন বৌ হয়ে দিব্যি হাতের মুঠোয়। মিলিকে বলি, খিদে পেয়েছে?

ও হ্যা সূচক মাথা নাড়ে।

সমুদ্র স্নানে যাবে?

ও না সূচক মাথা নাড়ে।

ওকে এটাচড বাথরুমে স্নান করে খেয়ে নিতে বলি। আমি সমুদ্র স্নানে যাই। এই প্রথমবার সমুদ্র স্নান সুখের হলো না। মিলিকে রুমে একা রেখে এসেছি। ও যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে...?

রুমে ফিরে দেখি মিলি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আচড়াচ্ছে। আমার দেয়া কলাপাতা রঙের থৃ পিস পরেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাই। দুপুর দেড়টা। এখনোই ভাত খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মনে মনে এ জীবনে বহুবার মিলিকে আদর করেছি। এখন সরাসরি আদর করার জন্য ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরি।

ও মায়াবী চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর ঝর ঝর করে কেদে দেয়। আমি ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরি। আদরে ভরিয়ে দিই মাখন শরীর।

দুই.

আমি ঠিক আছি। তিন বছর ধরেই ঠিক আছি। এখনো মিলি ছাড়া কিছুই বুঝি না। এখনো মিলির জন্য জীবন বাজি রাখতে পারি। ওর প্রতি আমার এই টান দেখে বন্ধুরা খুশি হয়, অবাক হয়, কখনো

সরু চোখে তাকায়। শেষমেষ হেসে বলে, বৌয়ের প্রতি এ রকম টান আজকাল খুব একটা দেখা যায় না।

মিলি ঠিক নেই। ঠিক নেই মানে ওকে ঠিক থাকতে দেয়নি তৃতীয় পক্ষ। তৃতীয় পক্ষ মানে কলেজের বন্ধু-বান্ধবী, ওর আত্মীয়-স্বজন।

ওরা চব্বিশ ঘণ্টা মিলিকে বোঝায়, অয়নের সঙ্গে বিয়ে করে তুই ভুল করেছিস। ওই ছেলের কি কোনো ভবিষ্যৎ আছে? খামাখা প্রেমে মজলি। তুই চাইলে আমরা তোকে এক্ষুণি নতুন করে বিয়ে দিতে পারি।

আমার বৌয়ের বয়স অল্প। তৃতীয় পক্ষের মধু মাখানো কথায় মাঝে মধ্যে টাল হয়ে যায়। আমার পাশে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নতুন ঘর বাধার রঙিন স্বপ্ন দেখে।

আমার মেজাজ খারাপ হয়। মিলিকে বলি, পালিয়ে বিয়ে করেছিলাম কি ইয়ার্কি মারতে? ফাজলামোর আর জায়গা পাচ্ছো না?

ও আমার কথায় গুরুত্ব দেয় না। বলে, বিয়ে করে আজো শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পারলাম না। বাপতো তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করলো। তাছাড়া আমার কপালে দুটো বিয়ে লেখা আছে। আমি জানি সেটাই হবে।

মুখে এসব কথা আনো কি করে? লজ্জা করে না?

লজ্জার কি আছে? মানুষ কি দুটো বিয়ে করছে না? হামেশাই করছে।

বৌয়ের কথাবার্তা ভালো লাগে না। বৌ, না ডাইনি বুঝতে কষ্ট হয়। আমি আরো ক্ষেপে গিয়ে বলি, পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি না করে গলায় দড়ি দিও। ট্রেন লাইনে মাথা দিও। না হলে গায়ে আগুন ধরিয়ে মরো। আমি তোমার জন্য জেল খাটবো, তবু সুখ। এই টেনশন আর ভালো লাগে না।

বালিশের এক পাশে মাথা রেখে মিলি চুপ করে থাকে।

মেয়েমানুষ আর ভালোবাসার সুন্দর কোনো অর্থ আমি এই মুহূর্তে খুজে পেতে ব্যর্থ হই।

কোটচাদপুর, ঝিনাইদহ থেকে

আনন্দ বেদনা

– মাসুদুর রহমান

দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২। অর্থাৎ গত বছরের ভ্যালেন্টাইনস ডে। আগে থেকেই প্রস্তুতি ছিল আমার মায়ের অপারেশনের। আমার মাকে কিছুদিন আগেই ঢাকায় এনেছি তার গলব্লাডারের অপারেশন করাবো বলে। ভর্তি করেছি ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে। অপারেশনের ডেট দেয়া হয়েছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। শত চেষ্টা করেও তারিখটি আগে বা পরে করতে পারিনি। দিনটি আর সবার মতো আমারও কাটতে পারতো প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে।

যাহোক, অপারেশন হবে সকাল সাড়ে দশটার। আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে সকাল আটটার আগেই মেডিকালে গিয়ে উপস্থিত। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন গত

রাতেই মায়ের অপারেশনের জন্য যতো ইন্সট্রুমেন্ট ও ওষুধপত্র প্রয়োজন তা কিনে দিয়েছি ডাক্তার সাহেবের কাছে। ঠিক কাটায় কাটায় দশটায় কর্তব্যরত ডাক্তার এসে আমাকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজে সাইন করিয়ে মাকে নিয়ে গেলেন অপারেশন থিয়েটারে। অপারেশনের সময় মায়ের পাশে আমি এবং আমার খালাতো বোন তিন্নি ও তার কয়েকজন বান্ধবী ছাড়া কেউ ছিল না। কেন ছিল না সে কথায় পড়ে আসছি।

পাঠক বুঝতেই পারছেন যেখানে একজন মায়ের অপারেশন, সেখানে সব কাগজপত্রে যার সই করার কথা অর্থাৎ আমার বাবার। তিনি তখন অনুপস্থিত ছিলেন।

টেনশনে আমার পরাণ পাখি উড়ে যায় যায় অবস্থা। দুটো ভয় আমার ভেতর কাজ করছিল।

এক. যদি মায়ের অপারেশন ঠিক মতো না হয় অর্থাৎ আল্লাহ না করুণ যদি মায়ের কিছু হয়ে যায় তবে আমার বাবা, ভাই–বোন, আত্মীয়–স্বজন সবাইকে কি জবাব দেবো। কারণ মায়ের অপারেশনের জন্য আমিই তাকে ঢাকায় নিয়ে এসেছি। তাছাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যে সাইন আমার নিয়েছে তাতে কি লেখা আছে তা আমার জানা আছে। সম্পূর্ণ দায় গিয়ে পড়বে আমার ওপর।

দুই. আমার মাকে প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসি। তাই তাকে ছাড়া আমার বেচে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ তিনিই আমার আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। বিস্তারিত লিখলাম না কেননা লিখলে বিরাট গল্প হয়ে যাবে।

এতোসব আবোল–তাবোল ভাবছি।

যাহোক, বেলা দুইটা পনেরো মিনিটের সময় মাকে অপারেশন থিয়েটার থেকে অবজারভেশন রুমে রাখা হলো। তখনো জ্ঞান ফিরেনি। দুঃশ্চিন্তায় আমার অবস্থা যে কি হয়েছিল তা এখানে লিখে বা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

ডাক্তার এসে বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল।

শুনে মনটা বেশ ভালো লাগলো। দূর থেকে শুধু দেখলাম মাকে অক্সিজেন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

কিছুক্ষণ যাবার পর জ্ঞান ফিরলে ডাক্তার এসে বললেন আপনার মায়ের জ্ঞান ফিরেছে, এখন আপনারা যেতে পারেন। আনন্দে আমার তখন বুক ভরে যাচ্ছে এই ভেবে যে আমার মাকে আবার সুস্থ দেখতে পাবো। আমার মা দীর্ঘ দিন ধরেই গলব্লাডারের পাথরের জন্যে অসুস্থতায় ভুগছিলেন। যাহোক, মাকে সুস্থ রেখে মেডিকাল থেকে রাত আনুমানিক এগারোটা হবে বাসায় ফিরলাম।

আমার বাসা ছিল ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বারে। রিকশা যখন শেরাটন হোটেলের সামনে ঠিক তখনই আমার সামনে চার পাচজন যুবক পিস্তল, ছোরা ঠেকিয়ে বললো যা আছে বের করতে। না হলে তারা আমাকে আঘাত করবে। কি আর করা?

পকেটে যা ছিল তা তো নিলই মোবাইলটাও নিল, যাবার সময় একজন আমার হাতঘড়িটাও নিল। এতো করে রিকোয়েস্ট করলাম কিন্তু কোনো কাজ হলো না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

দিনটি একদিক আমার মায়ের অপারেশন সাকসেসফুল হওয়ায়, অন্যদিকে ভ্যালেন্টাইনস ডে এ দুইয়ে মিলে দিনটি আমার কাছে আনন্দের মনে হয়েছিল। তবে দেশের এই চরম অবস্থার কথা ভাবতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল যে, আমরা রাজধানীর নাগরিকরা কি দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছি।

এ বছরে আমার সেই ঘটনার কথা বার বার মনে পড়ছে। আমার কাছে যতোদিন ভ্যালেন্টাইনস ডে–র কথা মনে হবে ততোদিনই সেই আনন্দ ও দুঃসহ বেদনার কথা চিরঅম্লান হয়ে থাকবে। মনে থাকবে ভ্যালেন্টাইনস ডে হলো কিছু পাওয়া ও কিছু হারানোর দিন।

ঘাটাইল, টাঙ্গাইল থেকে

পিছুটান

– সুমন্ত ফরহাদ

এখনো বলিনি যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বয়সের দোষে হোক আর স্বভাবের গুণেই হোক এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, তোমাকে আমি ভালোবাসি কিংবা তোমাকে আমার ভালো লাগে। ভালো লাগতেই পারে। ভালোলাগার অনেক কিছুই আছে তোমার মধ্যে। তাই বলে ভালোলাগাটা ভালোবাসায় গড়াবে কিংবা পৃথিবীর সব সত্যের মতো সব ভালোলাগা ভালোবাসাবাসিতে রূপান্তরিত হবে এমন তো কোনো কথা নেই। এতে ভনিতা করারও কোনো কারণ দেখি না। তবে হ্যা, প্রত্যাবর্তনের লজ্জা কিংবা প্রত্যাখ্যানের ভয় এখানে অবান্তর বৈকি!

সৌরভে ভালোবাসা হয় কি না আমার জানা নেই। আমার এটাও জানা ছিল না যে, জন্মদিনে উপহার দেয়া সতেরোটা গোলাপকে তুমি সতেরো রকমের কাহিনী বানিয়ে ইথারে, ইথারে ছড়িয়ে দেবে আর নিজেকে ধোয়া তুলসী পাতায় সিক্ত ভালোবাসার ভার্জিন কিংবা কল্পলোকের প্রেয়সী হিসেবে জাহির করবে। তোমার চাপার জোর আছে জানতাম। কিন্তু ততোটা গলাবাজি করবে এটা জানতাম না। খুব বেশি অবাক হইনি। মেনে নিয়েছি এটাই বাস্তব। তার সঙ্গে এটাও বাস্তব যে, হা করলে তুমি হাওড়া ছাড়াও আরো অনেক কিছু বুঝে ফেলো।

হয়তো বা তোমার গলাবাজির জোরেই কি না! সেদিন দেখি সুমনদা আমার পাসওয়ার্ড দেয়া ফাইলে তোমার নাম টাইপ করে পাসওয়ার্ড ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বলো, এটাও কি আমাকে মেনে নিতে হবে? ঘরে তুলে আনার মাধ্যমে যেমন মাঠের প্রেমের সার্থকতা ধরা হয় তেমনি বিয়ের মাধ্যমেই ভালোবাসার পূর্ণতা বিবেচিত হয়। আর তুমি ইতিহাসে আশ্রয় নেয়া সতেরো গোলাপের সতেরো গন্ধ বের করে কাটাগুলো এমন কুটিলভাবে বিছিয়ে দিলে যে, সুদূর খাগড়াছড়ি থেকে ছোট আন্টি তির্যকভাবে জিজ্ঞাসা করে, তুই নাকি তাকে ভালোবাসিস, তুই তাকে বিয়ে করবি। খবরদার, তোর জীবনটা একদম ভাজা ভাজা করে ফেলবে।

শুনে আমার হাসি পায় আবার দুঃখও হয়। হাসি কেন পায় জানো? মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া ওই গোলাপগুলোর কথা ভেবে। আর দুঃখ কেন হয় শুনবে? তোমার জন্য।

আপেল দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও দারুণ। তবে বেশি পেকে যখন পচে হাগুর গন্ধ বের হয় তখন একটু খেয়ে দেখতে পারো। নাহ! খাওয়ার দরকার নেই, শুকে দেখলেই চলবে। এখন তোমার অবস্থা সেই আপেলটার মতো যেটা বয়স পার হওয়ার আগেই পেকে পচতে শুরু করেছে।

হ্যা! মিথুন রাশির জাতিকা, তোমাকেই বলছি। তুমি যদি আরো কিছু ভেবে থাকো তাহলে এটা হবে তোমার গুরুতর ভুল এবং বড় বোকামি। যে বড় খালাম্মাকে মায়ের চেয়েও বেশি জ্ঞান করি সেই বড় খালাম্মা আজ আমাকে অন্য চোখে দেখেন। কেন, জানতে চাও? এর উত্তর শুধু তোমার জন্যই। আরেকটু হলে বড় খালাম্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধাটুকুও তুমি নড়বড়ে করে দিচ্ছিলে আর কি!

হ্যা, ভালোবাসার ভার্জিন (আলপিন)! আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। তুমি আরেকটু কষ্ট করে পড়াটা শেষ করো, এরপর তোমাকে আমার কোনো কথা শুনতে হবে না। এমনকি আমার কোনো লেখাও কপাল কুচকে পড়তে হবে না।

তরী, হ্যা, তরীর কথা মনে আছে তো? তোমার মা জননীর ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস আমার শেল্টারেই তরী তার তরী ছাড়ার সাহস পেয়েছে এবং আমার কারণেই ঘর ছেড়েছে। আমি ঘর করলাম না, সংসারও করলাম না। অথচ কি অবাক করা ব্যাপার। একটা অষ্টাদশী মেয়ে দুধের বোতল চুষতে চুষতে আমার মন্ত্র বলে তার বাবা-মা, ভাই-বোনকে তুচ্ছ করে চলে এসেছে আমি বাউলের কাছে। এটাকে পরকীয়া প্রেমের সার্থক উপমা বলবো, নাকি পৃথিবীর নবম আশ্চর্যের একটি বলা উচিত তা আমার মাথায় ঢুকছে না। এর উত্তর তরী আর তুমিই ভালো দিতে পারবে।

শোনো মেয়ে! গু চিনতে পেরেছো নিশ্চয়ই। সেটা তোমাদের পালিত রাজহাসের গু হোক আর গণবাথরুমের গু হোক, গু যতো ঘাটবে ততো বেশি গন্ধ ছড়াবে। যাক, মায়ের নিষেধ ভেঙে তোমার মা জননীর ওই ভুল ধারণা ভাঙার জন্য তোমাদের বাসায় যাওয়ার আদৌ কোনো ইচ্ছে আমার নেই। তোমার জানা উচিত, তরী যাকে আমি বোনের চেয়ে বন্ধু হিসেবেই বেশি জানি এবং মানি সেই তরী কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটির মল (হাগু) চত্বরে এই আমার সঙ্গে আড়ি দিল শুধু তোমার কারণেই। আর চুপ থাকতে পারলাম না। এবার আমার না বলা তিনটি কথা তুমি শুনে রাখো যা পথ চলার পাথেয় না হলেও ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। তুমি প্রস্তুত? হ্যা শোনো –

এক. আমি তোমাকে প্রচণ্ড, প্র-চ-ণ্ড রকম ভালোবাসি, এক কথায় যে ভালোবাসা ব্যাখ্যাতীত।

দুই. ঠিক যতোটুকু ভালোবাসি তার চেয়ে বেশি তোমাকে ঘৃণা করি। আবারও বলছি, ঘৃণা করি।

তিন. তৃতীয় এবং শেষ কথা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে মোটেও ইচ্ছুক নই, তুমি বলতে চাইলেও আমার কিছু করার নেই।

আজ ভালোবাসা দিবসে করুণ সুর তুলতে আমি আদৌ চাইনি। ভেবো না অতি আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করছি। এখানে তৃতীয়পক্ষ হয়ে পুরো বিষয়টা অবলোকনের চেষ্টা করেছি। আমার এ লেখা পড়ে তোমার রাগ হওয়ার কথা নয়। যদি হয়েই থাকে তাহলে আশা করি একটা অনুরোধ রাখবে। কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অন্তত আধঘণ্টা যোগাসন করে নেবে। এবং আমার জন্মদিনে তোমার গিফট**...**, নাহ, কাউকে কিছু বলবো না, কোনো গালগল্পও বানাবো না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। এতোদিনের সভ্যতা, ভব্যতা সব এক নিমিষেই তো আর ছাড়া যায় না। তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য রইলো একরাশ ভালোবাসাময় শুভেচ্ছা। তবে কিছুটা ভেজাল মিশ্রিত। আশা করি বুঝে ফেলেছো। সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। খোদা হাফেজ। ভালো থেকো, সুখে থেকো।

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা থেকে

পদ্মা

–ডা. মোহাম্মদ এনামুল হক

ঝর্না অপূর্ব সুন্দরী। সকলেই তাকে ভালোবাসতে চাই। আমরা দুজনই ইংলিশের ফাইনাল ইয়ারের বিদ্যার্থী। তার বাড়ি ভোলায়। খুব সাহসী। রূপেরও একটা দেমাক আছে।

পদ্মার ধারে টি–বাধের ওপর দাড়িয়ে নদীর দুরন্তপনা দেখছি। প্রবল স্রোত। পানি উতলাচ্ছে, পাক খাচ্ছে। সেদিন শ্রাবণের শেষ শুক্রবার। জেলেরা নৌকায় চড়ে মাছ মারছে, শ্রমিকেরা বালু লোড করে নৌকা ছোটাচ্ছে।

পদ্মার ওপারে দুইটা গ্রাম আছে। তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পার হচ্ছে। নদীটা শহর ঘেষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে। এপারে, ওপারে দুইটা বিডিআর ফাড়ি আছে।

সহসা ঝর্না বললো, চলো, নৌকা ভাড়া করে পদ্মার ওপারে যাই।

আমিও খুব সাহসী ছিলাম। পদ্মার ধারেই বাড়ি। নৌকা চালাতে ও সাতরাতে খুব দক্ষ ছিলাম। সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম।

ছোট একটা ইঞ্জিনচালিত নৌকা পাচশ টাকাতে ভাড়া করলাম, ইচ্ছা মতো সারা দিন ঘুরবো। মাঝিকে নিলাম না।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিলাম। নৌকা ছুটে চলেছে। ঢেউয়ের উপর উঠছে, নামছে। খুব ভালো লাগছে। বললাম, ঝর্না সাতার জানো?

আরে আমার বাড়ি ভোলায়। নদীর ধারেই আমাদের বাড়ি। আর আমি সাতার জানি না? বান্ধবীরা হেরে যেতো।

Man does not have any knowledge of next seconds and minutes and years. সুতরাং বলা তো যায় না। যদি নৌকা ডুবে যায়।

যাবে? তাতে কি? এ নদী আমাদের মারতে পারবে না। স্রোতের দিকে ভেসে যাবো। চারঘাট না হয় মিরগঞ্জে তো উঠতে পারবো।

হালটা ধরো তো ঝর্না।

কেন?

ইঞ্জিনে পানি দিতে হবে। শাড়ির আচল যেন ওড়ে না।

আচ্ছা, আচ্ছা। শক্ত করে কোমর বেধেই উঠেছি।

সুতরাং।

ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে নার্ভাস লাগছে কেন?

দেখো কতো নৌকা চলছে, ডুবছে না। আর তুমি কি বলছো? ধরো হালটা। হাত ব্যথা করছে।

যাহোক, শোনো, যদি ডুবে যায় তাহলে কনটেনারটা চেপে ধরে থাকবে। শাড়ি, পেটিকোট খুলে ফেলে দেবে। না হলে ডুবে যাবে।

কি, ন্যাংটা হবো! একদম আনসিভিলাইজড।

হঠাৎ কড়–কড়াৎ শব্দে আকাশের দিকে তাকালাম। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাসের ঝাপটায় বড় বড় ঢেউ উঠতে লাগলো। তেল শেষ। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। নৌকা ঘুরতে লাগলো। হালে কোনো কাজ করছে না।

আমি প্যান্ট–শার্ট জুতা খুলে ফেললাম। পানিতে নেমে হাল ধরে হালের কাজ করতে লাগলাম।

বললাম, ঝর্না, নৌকাকে ঢেউ বরাবর করতে পারছি না। নৌকা এক্ষুণি ডুবে যাবে। তুমি শাড়ি আর পেটিকোট খুলে ফেলো। তাড়াতাড়ি কনটেনার শক্ত করে ধরে থাকো। মরলেও ছাড়বে না।

আমি ন্যাংটা হবো?

কে দেখছে? আমার তাকানোর সময় নেই? তোমার প্যান্টি তো আছে!

একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ে নৌকা ডুবে গেল।

ঝর্না কনটেনার নিয়ে ভাসছে। আরেকটা ঢেউতে সে কনটেনার ধরে রাখতে পারলো না। আমি কাছে গেলাম। সে ডুবছে, উঠছে। শাড়ি ও পেটিকোট খুলে দিলাম। উচু করে ধরলাম। বললাম, সাতরাও স্রোতের দিকে।

আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরলো বললাম, ঝর্না, তুমি কোথায়? তাকালাম। দেখলাম আমরা হাসপাতালে।

নার্স বললো, বিডিআর জওয়ানরা আপনাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে রেখে গেছে।

তাদের দুর্জয় সাহসকে অশেষ ধন্যবাদ। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাদের ঋণ জীবনেও শোধ করা যাবে না।

ঝর্নারও জ্ঞান ফিরেছিল। সে বললো, তোমার ভুলের জন্যেই মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলাম।

কেমন?

ট্যাংকে তেল লোড ছিল কি না দেখেছিলে?

আচ্ছা, আচ্ছা। আমরা আবার ১৪ ফেব্রুয়ারি উদযাপন করবো।

ঝর্না ঘাড় বাকিয়ে তাচ্ছিল্য করে বললো, পরাজিত সৈনিক! আবার পদ্মা?

নার্স বললো, স্যালাইন চলা অবস্থায় এতো কথা বলবেন না। ঘাড় সোজা করুন।

খাস মথুরাপুর, কুষ্টিয়া থেকে

পরাজিত

– আকাশ এম.কে চৌধুরী

সময়টা ১৯৭৭ সাল। সবেমাত্র এসএসসি পাস করে মফস্বলের একটি কলেজে ভর্তি হয়েছি। বয়স মাত্র পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়ার আনন্দে বাকবাকুম অবস্থা। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত বালিকাদের নাক, মুখ, বুক, চোখ দেখার জন্য অবর্ণনীয় এক প্রতিযোগিতা। ক্লাস থাক আর না থাক, কলেজে উপস্থিত হতেই হবে। নতুন গজানো দাড়ি গোফের মতো, মুখে না থাকলেও শেভ করতে হবে। কলেজ জীবনের পুরোটাই একটা উচ্ছলতার মধ্যে কাটিয়েছিলাম। মফস্বলের কলেজ হলেও আধুনিকতার ছোয়া ছিল শহরতলিতে অবস্থানের কারণে।

কলেজ জীবনে প্রথম কো–এডুকেশনের স্বাদ পাওয়াতে অন্য এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম যে জগতের সঙ্গে আমার পরিচিতি ছিল খুবই কম। অবশ্য এগারো বছর বয়সে এক যৌবনবতী বালিকা আমার স্বাদ নিয়েছিল। কিন্তু বয়স অল্প ছিল বলে তার স্বাদ নিতে পেরেছি বলে মনে হয়নি।

পাশের বাড়িতে কোনো বয়স্ক পুরুষ না থাকার সুবাদে তাদের যুবতী বালিকার ইচ্ছার কারণে তার নিরাপত্তার জন্য রাতে আমার থাকার ডাক পড়েছিল। আমি অবোধ বালকের মতো তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর উপলব্ধি করলাম আমাকে সে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে ফেলতে চাইছে। আমি ছিলাম ভয়ে আড়ষ্ট। তবে বেশ পুলকও অনুভব করছিলাম। অবশেষে সেই যুবতী আমাকে নিরাবরণ করেছিল এবং আমার ওপর চড়াও হয়ে তার আদিম ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিল। আর আমি বেআক্কেল ছিলাম সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট ও নির্বাক। যাক সে কথা।

কলেজ জীবনে এসে প্রথমবারের মতো বালিকাদের কোলাহল আমার কচি মনে প্রভাব ফেলেছিল। আমার অনুসন্ধিৎসু চোখ বিজ্ঞান বিভাগের শ্যামবর্ণের ঝরা (ছদ্ম নাম) নামের সেই মেয়েটিকে আবিষ্কার করলো কলেজের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে। অতএব বিসমিল্লাহ বলে ভালোবাসার স্বর্গ রচনায় ব্রতী হয়ে গেলাম। বাংলা ও ইংরেজি ক্লাসে আমার কাজ ছিল তার দিকে তাকিয়ে থাকা। তার পেছনের বেঞ্চে বসতে পারলে তার চুলের গন্ধ নেয়া।

বাংলা ও ইংরেজি ক্লাসে স্যারের লেকচার কোনোদিনই শুনতাম না। শুনবো কি করে? আমি যে মজনুর দলে চলে গিয়েছিলাম।

প্রথম প্রথম চোখে চোখ পড়লেই সে ফিরিয়ে নিতো। পরের কয়েকদিন চোখ বড় করে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সবশেষে মুকাভিনয় করে বোঝাতে চাইতো আমার লেসুমি (মেয়েদের দিকে তাকানোকে আমরা *লেসু* বলে আখ্যায়িত করতাম) স্যারকে বলে দেবে। কিন্তু না, কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছে না।

অবশেষে আমার অধ্যবসায়ের কাছে সে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। সেই শুভদিনে কলেজে গিয়েছিলাম সকাল দশটায়। দেখি কলেজে কোনো প্রাণী নেই। মেয়েদের কমনরুমের সামনে আমার শ্যামলা রঙয়ের সেই ব্ল্যাক ডায়মন্ড প্রেয়সী। খুব মুড নিয়ে তার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম।

সেই প্রথম কথা বললো। চৌধুরী সাহেবের কি আজ প্র্যাকটিকাল আছে?

উত্তরে বললাম, জি আছে, যুক্তিবিদ্যার প্র্যাকটিকাল।

যুক্তিবিদ্যার প্র্যাকটিকাল আছে! আজই প্রথম শুনলাম।

জীববিদ্যার প্র্যাকটিকাল থাকতে পারলে যুক্তিবিদ্যার থাকতে দোষ কোথায়?

দেখতে তো পিচ্চি মনে হয়। কিন্তু কথা তো চটাং চটাং। শিখেছেন কোথায়?

ছোট মরিচের ঝাল বেশি, এটা নিশ্চয়ই অজানা নয়।

এভাবে চটুল বাক–বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাতে থাকা একটা আমলকি এগিয়ে দিয়ে বললো, আমলকিতে ভিটামিন সি আছে। মুখের ব্রন চলে যাবে।

বললাম, মুখের ব্রন আমলকিতে যাবে। কিন্তু মনের শান্তি কি দিয়ে আসবে, এটা বলুন না?

এবার সে সিরিয়াস হয়ে বললো, আমি চার পাচ মাস যাবৎ লক্ষ্য করছি আপনি আমাকে ফলো করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে ধর্ম নামের যে বিশাল দেয়ালের ব্যবধান তা ডিঙানো যে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং এ সব পাগলামো করা কি ঠিক হচ্ছে?

হ্যা, আমার সেই ব্ল্যাক ডায়মন্ড ছিল বুড্ডিস্ট। বললাম, তুমি তো আমাকে পাগলই করেছো, পাগল তো ধর্ম–কর্ম করে না, বোঝেও না। সুতরাং পাগলের জন্য ধর্মের দেয়াল ডিঙানো কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। এখন তোমার চিন্তা ভাবনা কি তাই বলো।

সে বললো, আমি কোনো চিন্তা করিনি। আমাকে কিছুদিন সময় দাও।

এরপর কলেজের ক্লাসের ফাকে, ক্লাস শুরুর আগে আমাদের কথাবার্তা হতো। অবশ্য কোনোদিনই সীমা অতিক্রম করিনি।

সেকেন্ড ইয়ারে সে একদিন বললো, তার মা আমাকে দেখতে চেয়েছেন।

একদিন বন্ধু ব্রজেন্দকে (ছদ্মনাম) নিয়ে হাজির হলাম স্বপ্নের সে কুড়ে ঘরে। ছোট্ট একটা ছনের ঘরে সে আর তার চাকরিজীবী মা থাকেন। বাবা নেই। এক ভাই নিরুদ্দেশ। ঘরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়লো বিশাল ফ্রেমে বাধা গৌতম বুদ্ধের ছবি। দেখেই ধরে নিলাম এমন ধার্মিক মায়ের মেয়েকে আমার মতো বিসমিল্লাহ বলা ছেলের হাতে কখনোই তিনি তুলে দেবেন না। তবুও দোয়া–দরুদ পড়ে ঘরে ঢুকে বসে পড়লাম।

প্রথমে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো?

বললাম জি ভালো আছি। রান্নাঘর থেকে আমার ব্ল্যাক ডায়মন্ডের হাসির শব্দ পেলাম। তিনি নাশতা তৈরির কাজে ব্যস্ত। হাসির কারণ অবশ্য পরে জেনেছিলাম। তারা জি শব্দের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়। জি শব্দটি মুসলিমদের ভাষা। আমি জি বলাতেই সে হেসে ফেলেছিল।

নাশতা এলো। ঝালমুড়ি, বিস্কিট, চানাচুর, চায়ের কাপে গরুর দুধ। নাশতা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেলেও প্রেয়সীর হাতের ঝালমুড়িকে সন্দেশ মনে করেই খেলাম। নাশতার পর শুরু হলো জ্ঞানদানের পালা।

তার মায়ের জ্ঞানের যার কথা হলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, মা বাবার মুখ উজ্জ্বল করো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে তোমার জন্য পাগল হবে। আমার মেয়ে তো কালো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তোমার ধর্ম ইসলাম, আমাদের ধর্ম বৌদ্ধ। এই ধর্মের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, সমাজ এটা মানবে না। আমাদেরকে, তোমাকে সমাজচ্যুত করবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করার কারণে সারাটা জীবনই তোমাদের অপমানের ঘানি টানতে হবে। তবে হ্যা, তুমি আমার ছেলের মতোই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে।

আমি স্ট্যাচু–র মতো নির্বাক থেকে তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনলাম। আশাভঙ্গের বেদনায় আমার বুক ফাটা কান্না কোনো প্রকারে সংবরণ করলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

আসার সময় প্রেয়সীকে দেখলাম দরজার আড়ালে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম ইতিমধ্যে সেও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

দুই দিন ভীষণ কষ্টে কাটালাম। কলেজে গেলাম না। তৃতীয় দিন কলেজে গেলাম একটু আগে। দেখলাম সে আমার আগেই এসেছে। তাকে নিয়ে দোতলায় উঠলাম। বললাম, আমি এখন কি করবো? আমার পাগলামি তো ফাজলামো নয়। আমি তো সত্যি সত্যিই প্রেমের পাগল। আমি যদি ধর্মের বাধা ডিঙানোর সাহস করতে পারি তাহলে তুমি কেন পারবে না?

সে কোনো কথা বললো না, মুখ নিচু করে তাকিয়ে থাকলো।

চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরলাম। দেখলাম তার চোখে পানি। তাকে বুকে টেনে নিলাম। চোখের পানি মুছে দিলাম। জীবনে প্রথম কোনো নারীকে চুমু খেলাম।

আমার আদর পেয়ে সে ডুকরে কেদে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তোমাকে কি রকম ভালোবাসি তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তোমার জন্য মায়ের সঙ্গে প্রতি রাতেই ঝগড়া হয়। তবুও মায়ের অবাধ্য হতে পারবো না। কারণ বাবার স্নেহ আমি পাইনি। আমার কাছে মা–ই সব। সুতরাং মা যা চাচ্ছেন বা চাইবেন তার বাইরে কোনো কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মায়ের বক্তব্য হলো, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তিনি বেইমানি করতে পারবেন না। জীব হত্যা মহাপাপ। জেনেশুনে তিনি কোনো জীব হত্যাকারীর হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারবেন না।

বললাম, তিনি ধর্মটাকে বড় করে দেখলেন। মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখলেন না। এটাই আমার কাছে বড় দুঃখ হয়ে থাকবে।

এরপরও আমাদের মেলা–মেশা, কথা–বার্তা কখনো বন্ধ ছিল না। এতো কিছুর পরও আমার অবুঝ মন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতো। মনে করতাম হয়তো একদিন তার মা আমাদের সম্পর্কটা মেনে নেবেন।

এভাবেই আশা–নিরাশার মধ্যে এইচএসসি পাস করলাম। দুজনেই চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। সে ভর্তি হলো বাংলায়, আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথম আনন্দের দিনেই তখনকার সময়ে আমার জীবনে দুঃখজনক সংবাদটি শুনেছিলাম। ঝরা প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এসেই সাত দিন পর স্থানীয় সরকারি চাকুরে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ের তারিখের সংবাদ আমাকে জানালো। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে, এমনই আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন।

ঝরা আমাকে অনেক বোঝাতে চাইলো। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বললো। যদি সত্যিই তাকে ভালোবাসি তাহলে দুজনের মঙ্গলের জন্য বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার অনুরোধ করলো। ভবিষ্যতে নৈতিকতার আলোকে সম্পর্ক রক্ষা করার অঙ্গীকার করলো।

তাকে শুকনো ধন্যবাদ জানালাম। তার শুভ কামনা করলাম। ধর্মের কাছে পরাজিত হয়ে ভালোবাসার ছোট্ট এক অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে তাকে ট্রেনে তুলে দিলাম। মনে হলো কি যেন হারিয়ে ফেলেছি।

ঝরা চলে গেল আমার জীবন থেকে। অবুঝ মনে হঠাৎ করে উদয় হওয়া অপরিণত ভালোবাসা হঠাৎ করেই নীল আকাশে মিলিয়ে গেল। ছয় বছরের ইউনিভার্সিটি জীবনে সেশনজটসহ তার স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে আর কাউকে স্থান দিতে পারিনি। ভালো ছাত্রের সুনাম থাকার কারণে এক সহপাঠিনী ভীষণ বিরক্ত করলেও ভালোবাসার অমর্যাদা হবে ভেবে তাকে প্রশ্রয় দিইনি। অবশেষে মেধা

তালিকায় স্থান নিয়ে অনার্সসহ এমএ পাস করে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলাম।

মা, বাবার অনুরোধ ও সুন্নত পালনের জন্য বিয়েও করেছি। আমাদের সংসারে এসেছে প্রাণপ্রিয় দুই সন্তান। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের সেই পিচ্চি ছেলেটিকে আজ চট্টগ্রাম শহরে অনেকে চেনে। নিজের প্রচেষ্টার অর্জনে আজ আমি সন্তুষ্ট। এতো কিছু প্রাপ্তির মধ্যেও এখন অলস অবসরে তাকে মনে পড়ে।

একই শহরে থাকি বলে তার সঙ্গে দেখাও হয়, কথাও হয় সামান্য। তার স্বামীর বয়স হয়েছে। কিছুদিন পর চাকরি থেকে রিটায়ার করবে। বড় ছেলে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। মেয়ে এসএসসি পাস করেছে। দেখে মনে হয় তার মধ্যেও শূন্যতা আছে। তার মা বেচে আছেন। আমাকে দেখতে চান মাঝে মধ্যে। আমি সময় করতে পারি না বলে যাওয়া হয় না।

অলস অবসরে যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ভাবি, আসলেই আমরা সবাই অবচেতন মনে স্ব স্ব ধর্মকে ধারণ করে থাকি। সেদিনের আমার স্বল্প বয়সী আবেগের কারণে ধর্মের বাধা অতিক্রমের যে দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম আজ পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে, সেদিনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। সেদিন যদি ঝোকের বসে তাকে বিয়ে করতাম তাহলে আজকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। বড়জোর কেরানি হয়েই থাকতে হতো। First you deserve, then you desire. এই আপ্তবাক্যটি সকলে যদি মনে রাখে এবং মেনে চলে তাহলে সমাজ অনেক দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত থাকবে।

চট্টগ্রাম থেকে

লজ্জা

– সাইফুল ইসলাম

তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। খালাতো বোন শিমু পড়ে সিক্সে। সে একবার আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। সঙ্গে তার ছোট ভাই শিপন। নির্দোষ বয়স হিসেবে আমরা একই বিছানায় শোয়ার সুযোগ পাই। মা এক কর্নারে, তারপর শিমু আর শিপন শুয়েছে আমার ও শিমুর মাঝখানে। নিরাপত্তা দেয়ালের মতো।

এ কথা, সে কথা, রাত গভীর হলো। এখন ঘুমানোর পালা। কিন্তু বাতি নিভিয়ে দেয়ার অনেকক্ষণ পরও ঘুম এলো না। মাথার মধ্যে দুষ্ট চিন্তা খেলা করতে লাগলো। সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে হাফপ্যান্টের জিপার ফুলে উঠলো। এক সময় সাহস করে হাত বাড়িয়ে শিমুকে ছুয়ে দিলাম। তার মাথার পেছনে হাত রাখলাম। বড়শি পাতানোর মতো চুপচাপ অপেক্ষায় আছি। তার দিকে থেকে কোনো প্রতিবাদ বা সাড়া আসে কি না। তার নীরব থাকার বিষয়টিকে সবুজ সংকেত বলে মনে হলো। ভাবলাম, হাতটিকে প্রমোশন দেয়া যাক। এরপর হাতটি তার মাথা থেকে সরিয়ে গাল গড়িয়ে তার বুকের ওপর এনে রাখলাম। তার বুকে সবেমাত্র লটিমের মাপে মাংস জমেছে। পুরোটাই মুঠিতে

নিয়ে আলতো টিপুনি দিলাম। এতেই বিপত্তি ঘটলো। শিমু মনে হয়, এতোক্ষণ মুখ বুজে সহ্য করেছিল।

টিপুনি পেতেই আড়মোড়া ভেঙে মাকে ডাকতে লাগলো। খালাম্মা, দেখো না, বুকে কেমন খামচি দিচ্ছে।

আমি সুরুত করে হাতটিকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে এনে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলাম।

ঘটনাটির এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত বলে কথা। মা মনে হয় বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। শিমুকে সান্ত্বনা ও ঘোলাটে পরিস্থিতিকে সামাল দেয়া তার কর্তব্য। শিপনকে মা হালকা ধমক দিয়ে বললেন, এই শিপন, দুষ্টুমি করো না।

ভাবলাম বাচা গেল। কিন্তু না।

মায়ের কথা শেষ না হতেই শিমু জল্লাদিনীর মতো বলে উঠলো, শিপন না খালা, শিপন ঘুমিয়েছে।

বুকটা ছাৎ করে উঠলো। আবারও চোখে কপাট লাগিয়ে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

এরপর ষোলটি বছর পার হয়েছে। শিমুর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাইনি।

মধুপুর, টাঙ্গাইল থেকে

সেকাল

– সাজেদা হোসেন

আজকের এই সেলুলার ফোন ও ইন্টারনেটের যুগে এ কাহিনী হয়তো হাস্যকর মনে হবে ছেলেমেয়েদের কাছে। তবুও ন্যাপথালিনের গন্ধওয়ালা পুরনো সেই কাহিনী হয়তো কারো কারো ভালো লাগতেও পারে। আমি লিখছি প্রায় পয়তাল্লিশ বছর আগের কথা।

আমরা দুটি বোন। আপা ক্লাস এইট অথবা নাইনের ছাত্রী আর আমি বেশ ছোট, ক্লাস ওয়ান অথবা টুতে পড়ি। আপা ছিলেন খুবই সুন্দরী।

আমাদের পাশের বাসায় একটি হিন্দু পরিবার ছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে খেলতো। তাদের ঘরের দেয়ালে একটা রাধাকৃষ্ণের যুগল ছবি ছিল। আমি মুগ্ধ চোখে রাধার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার আপাকে ঠিক ছবির রাধার মতো লাগতো। হাটু পর্যন্ত এক ঢাল রেশম–কালো চুল। দুধে–আলতা গায়ের রঙ। বড় বড় টানা চোখ। মাঝারি উচ্চতা। তার উপর সরকারি স্কুলের ছাত্রী। স্কুল বাসে চেপে স্কুলে যান আর আসেন। এমন কন্যার জন্য পাড়ার রোমিওরা তো হামলে পড়বেই। তবে তখনকার রোমিওদের প্রকাশভঙ্গি ছিল খুবই মার্জিত।

মনে আছে, সকালে ঘুম ভেঙে ঝুল বারান্দায় গেলে প্রায়ই একটা লাল গোলাপ পড়ে থাকতে দেখতাম। আমি খুশি হয়ে তুলে নিয়ে আসলেই আম্মা তেড়ে আসতেন। বলতেন, যা, এখনি বাইরে ফেলে দিয়ে আয়।

মাঝে মধ্যে পাড়ার উত্তমকুমার ধাচে চুল কাটা ভাইয়ারা আমাকে ডাকতো। চুপি চুপি একটা খাম ধরিয়ে দিতো আর বলতো, তোমার আপাকে দিও, কেউ যেন না দেখে।

আমার বেশ মজা লাগতো। সেসব চিঠি এনে আপার হাতে দিতাম। আপার লালচে হয়ে ওঠা চেহারা দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। আপাকে তখন আরো সুন্দর লাগতো। আপা অবশ্য কোনো কোনো রোমিওদের ডাকে সাড়াও দিতেন। আবার ধরাও পড়ে যেতেন আম্মার কাছে। ফলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেতো সেসব ভালোলাগা।

এদেরই একজনের সঙ্গে আপা বেশ জড়িয়ে গেলেন। অবশ্য সেটা গল্পের বই-এর ভেতরে চিঠি দেয়া-নেয়া আর অল্প একটু চোখের দেখা, দুটি একটি কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা এখনকার মতো এতো সুযোগ-সুবিধা তখন ছিল না। বাইরে গিয়ে দেখা করার কথা তো কল্পনাই করা যেতো না। কিন্তু আপা এবারও ধরা পড়ে গেলেন। আমাকে চেপে ধরতেই আম্মার জেরার মুখে সব বলে দিলাম কাপতে কাপতে। আপার স্কুল যাওয়া বন্ধ হলো। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হলো। তখনকার দিনে প্রেমের বিয়েতে গুরুজনদের ঘোরতর অনীহা ছিল পাত্র যতো উপযুক্তই হোক না কেন।

আপা সুপাত্রী ছিলেন। তাই আপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল দ্রুত। বলাই বাহুল্য, গুরুজনদের পছন্দসই পাত্রের সঙ্গে। এক সময় বিয়ের দিনটিও এসে গেল। আমি তখন ক্লাস থৃ-তে পড়ি।

স্পষ্ট মনে আছে সেদিনটির কথা। সেটি ছিল বিয়ের আগের দিন। আমরা প্রায় সমবয়সী খালাতো, মামাতো ও চাচাতো ভাইবোনেরা মিলে হই চই করছি। তখনকার দিনে বিয়ের অনুষ্ঠান বাসায়ই হতো। এখনকার মতো এতো কমিউনিটি সেন্টার ছিল না। ছাদ অথবা বাড়ির সামনের খালি জায়গাতে শামিয়ানা টানানো হতো। বর বসতো বৈঠকখানা ঘরে। রঙিন কাগজ কেটে ঝালর ও শিকল তৈরি হতো। তা দিয়ে সাজানো হতো বাড়ি। দেবদারু গাছের পাতা দিয়ে গেট বানানো হতো। আমরা সব ভাইবোনেরা আঠা দিয়ে শিকল আটকাচ্ছি হঠাৎ দেখলাম মুরুব্বিদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। ফিশফাশ করছে সবাই। আমাদের ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের মধ্যে এক ভাই বেশ সেয়ানা ছিল, বয়সেও একটু বড়। সে খবর আনলো, আপার পূর্ব প্রেমিক নাকি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে, বিয়ের আসরে সে লোকজন নিয়ে বর সেজে আসবে, জোর করে আপাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তার কাছে প্রমাণ হিসেবে আপার লেখা চিঠিগুলো তো আছেই। খবর পাকা ছিল কারণ সংবাদদাতা ছিলেন আমাদেরই এক আত্মীয়।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। এ কথা শুনেই আমার প্রাণপ্রিয় আব্বা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাকে মাথায় পানি ঢেলে সুস্থ করা হলো। আম্মা বিলাপ করে কাদতে লাগলেন। এই সুযোগে অনেক আত্মীয়স্বজন কটু কথা শোনাতে ছাড়লেন না আব্বা আম্মাকে। আপাকে স্কুলে পড়ানো নিয়ে তারা অনেকেই খুশি ছিলেন না।

আমি স্তব্ধ হয়ে আব্বার কাছে বসে রইলাম। আব্বার সেই অসহায় চেহারাটা এতো বছর পরও আমার চোখে ভাসে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে আমার ছোট চাচা ও খালুজান এগিয়ে এলেন। তারা সে রাতেই বরের বাসায় গিয়ে সব খুলে বললেন। আমার দুলাভাই উচ্চ শিক্ষিত ও উদার মনের ছিলেন। তিনি অল্প কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিয়ে সাধারণ পোশাকে চলে এলেন আমাদের বাসায় সে রাতেই। বৈঠকখানা ঘরে তিনি ওনাদের নিয়ে রাতে থেকে গেলেন।

সে রাতেই আমার আপাকে হলুদ দিয়ে গোসল করানো হলো। তখন বোধহয় রাত একটা হবে। শীতের রাত ছিল। মনে আছে, আপা ঠক ঠক করে শীতে কাপছিলেন। ভয়েও বোধহয়।

সারা রাত সবাই সজাগ থাকলো। পরদিন ভোরে বিয়ে পড়ানো হলো। আপা গোলাপি মসলিনে ঘোমটা টেনে চোখের পানিতে কাজল ধুয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। আর সেখানে মনোযোগ দিয়েই ঘরকন্যা করতে লাগলেন। এক বছর পর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন।

ধীরে ধীরে সবাই ভুলেও গেল সেসব ঘটনা।

এবার বলি আমার কথা। আমি আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠলাম। দেখতে আপার মতো সুন্দরী না হলেও একেবারে ফেলনা ছিলাম না। *মিষ্টি মেয়ে* বলে পাড়ার ছেলেরা ডাকতো। বেশ কয়েকজনকে বাসার সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম। কেউ কেউ সাইকেল থামিয়ে ঘণ্টি বাজাতো আবার স্কুলে যাওয়ার পথে অনুসরণও করতো। গোলাপ ফুল ছুড়ে মারার ঘটনাও ঘটতে লাগলো।

কিন্তু আমার মনে ছোটবেলার সেই ভয়ংকর স্মৃতি তখনো জ্বল জ্বল করতো। কিছুতেই ভুলতে পারতাম না আব্বার সেই অসহায় অবস্থাটা। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কখনো প্রেম করবো না। আগ্রহী ছেলেদের স্যানডাল দেখিয়ে দিতাম এবং বেশি বিরক্ত করলে আব্বার কাছে নালিশ করতাম। আব্বা তাদের বাড়িতে গিয়ে মা-বাবাকে ডেকে সাবধান করে আসতেন। তখনকার ছেলেরা এখনকার মতো এতো প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল না। বকাঝকা করলে সুড়সুড় করে চলে যেতো।

আমি ক্লাস টেনে উঠলাম। সেটা হবে ১৯৬৭ সাল। আমার প্রতিজ্ঞায় তখনো আমি অটল। ক্লাসের মেয়েদের দেখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমপত্র পড়তে আর লিখতে। ইচ্ছা যে আমারও হতো না তা নয়। কিন্তু ছোটবেলার সেই ঘটনা মনে পড়লেই গুটিয়ে যেতাম।

একদিন আমি আর আমার বান্ধবী পর্ণা স্কুল ছুটির পর এক সঙ্গে বাসায় যাচ্ছি রিকশায়। বাসায় যাওয়ার পথে তিন রাস্তার একটা মোড় ছিল। সেখানটায় সব সময়ই একটু ভিড় লেগে থাকতো।

সেদিনও রিকশাটা থেমে থেমে চলছে। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে দাড়িয়ে আছে ডান পাশের বাড়িটার গেটে। একদৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে চাহনিতে যে কি ছিল তা বলতে পারবো না। তবে বাসায় এসে বার বার মনে পড়ছিল সে চোখ দুটি।

পরদিন ছুটির সময় কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে সেদিকে চোখ চলে গেল। চমকে উঠি! কালকের মতোই সে দাড়িয়ে আছে মুগ্ধ দুই চোখে। পর পর বেশ কয়েকদিন তাকে দেখলাম। আমার ভেতরে কি এক অস্থিরতা। বার বার তার মুখখানি মনে পড়ে। পড়াশোনায় কোনো মনোযোগ ছিল না। স্কুলে বার বার আপাদের বকুনি খাচ্ছিলাম। আমার অবস্থা পর্ণা বুঝে ফেলেছিল। সে খবর আনলো ওই বাড়িটির অধিবাসী আমাদেরই এক সহপাঠিনী পারভীন। ছেলেটি পারভীনেরই খালাতো ভাই। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। কলেজ বন্ধ হওয়াতে বেড়াতে এসেছে।

একদিন পারভীন চুপি চুপি আমার হাতে একটি খাম গুজে দিল। থর থর করে কেপে উঠলাম। বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দটা বোধহয় বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। বাসায় এসে ছাদে চলে গেলাম। ছাদে ওঠার সিড়িটা খুব খারাপ থাকায় বয়স্করা কেউ ছাদে উঠতে পারতেন না। তাই ছাদটা প্রেমপত্র পড়ার পক্ষে বেশ নিরাপদ ছিল। কাপা হাতে খাম খুলতেই একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সঙ্গে গোটা গোট অক্ষরে লেখা একটা পাতলা ফিনফিনে নীল কাগজ। প্রথমেই যার সম্বোধন *প্রিয়তমা।*

কান, মাথা সব ঝা ঝা করে উঠলো। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। আবার পড়লাম। সে এক অচেনা, অপূর্ব অনুভূতি। ছবিটা দেখলাম অনেকক্ষণ। অপূর্ব সে মায়াভরা চোখ দুটি যেন চেয়ে আছে আমারই দিকে। এখন আমি কি করি?

অস্থির লাগতে লাগলো। পড়াশোনা আর খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠলো। পর্ণা উত্তর দেয়ার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো।

প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখি আবার ছিড়ে ফেলি। দিতে সাহস হয় না। কেবলই আব্বার সেদিনের সেই করুণ মুখটা মনে পড়ে যায়। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কয়েকদিন স্কুলে গেলাম না। তারপর যেদিন স্কুলে গেলাম সেদিন দেখি কেউ নেই আমার অপেক্ষায় দাড়িয়ে। জায়গাটা খালি। কলেজ খুলে যেতে সে চলে গেছে। আমার ভেতরটা কষ্টে জ্বলে-পুড়ে যেতে থাকলো।

সময়ে সব সয়ে যায়। আস্তে আস্তে ভুলেও গেলাম। রয়ে গেল শুধু সেই ছবি আর চিঠিটা।

আমার বিয়ের দুই দিন আগে ছাদে গিয়ে সেই চিঠি এবং ছবিটা কুচি কুচি করে ছিড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম।

ঢাকা থেকে

উদাস দুপুরে

মা বলেন, ও তো সেদিনের। মুক্তিযুদ্ধের বছরে সে আমার কোলে।

স্বাধীনতার লড়াই, ১৯৭১ সাল, সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, বঙ্গবন্ধু, জিয়া আমার চোখে সবই ইতিহাস। দেয়ালে টাঙানো ফটো।

আমার বয়স : ৩৪।

কর্মজীবন : ইটালির নোমানা শহর।

পেশা : কাঠমিস্ত্রি, ফার্নিচার কারখানার শ্রমিক।

গত এক যুগ ধরে ইটালি-তে এস্টাবিলিশড হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টায় অনবরত দৌড়াচ্ছি। এক পায়ে দাড়িয়ে আজ প্রায়ই চলে যাই শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের উত্তাল দিনে।

খুজে ফিরি সান্ত্বনা অথবা সুখ।

চট্টগ্রামে থাকতাম। পতেঙ্গা স্কুল থেকে ১৯৮৭ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে গেলাম গ্রামের বাড়ি বরিশালের মুলাদীতে। মা আমার একা থাকেন বাড়ি। আমি যাওয়াতে মায়ের পৌষ মাস। রাতে বেড়াতে এলেন মেজআপা তার ননদের মেয়েকে নিয়ে। কি দেখলাম কি হলো? হৈমন্তীর অপুর মতো *আমি পাইলাম, আমি পাইলাম।*

জীবনের প্রথম দিশেহারা ইমোশন চলে গেল নাগালের বাইরে। ড্রয়ার হাতিয়ে কলম, ছোট বোনের খাতা থেকে এক টুকরা শাদা কাগজ। অতঃপর অদক্ষ হাতে লাভ লেটার।

পুরো গ্রাম কুয়াশার চাদরে নীরব নিস্তব্ধ।
আমিও নীরবে সম্মতি চাচ্ছি তোমার।
কাপা কাপা হাতে ভাজ করে সযত্নে চালান করলাম বুক পকেটে। ডেলিভারির চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয়ের অতলে শুনতে পাচ্ছি মিষ্টি মিউজিক।
পরের দিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিড়ি হাতে। জীবন সরল রেখায় চলে না। সেই সূত্রে গ্রামের কলেজে ভর্তি হলাম। গরম ভাত খেয়ে ক্লাস, ধান বেচা টাকায় বিড়ি, ভুয়া প্রাইভেট পড়ার নামে টাকা এনে ব্যয় হতো কসমস, থাই লিভস, রোডস্টার-এ। প্রেম জীবনে একবারই আসে এই সত্য অসত্য হলো। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ভালোবাসায় পড়লাম।
বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয় এ উক্তিকে আরো এক ধাপ মাড়িয়ে তিনি আসতেন। ভালোই লাগতো। কিন্তু চলে গেলে আমার পুরুষ অঙ্গ ব্যথা করতো।
ছুটি-ছাটা, শরীর খারাপ, ফাকফোকর প্রেমেও চলে। আমি আমার এই সময়গুলো ইপি নামে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে শেয়ার করেছি। বন্ধু তুমি ভালো থেকো।
১৯৯৫-এ বিয়ে করলাম। ১৯৯৭-তে আমার মেয়েটি এলো দুনিয়াতে। আমার বৌ খু-উ-ব ভালো। তারপরও উদাস দুপুরে ভিড় করে সব অতীত স্মৃতি।

নাম ঠিকানা বিহীন
ইটালি থেকে

কনে দর্শন

– মাহাম্মদ মোশাররফ হুসাইন মিন্টু

এলএলবি পৃলিমিনারি পাস করার পর পরই বাবা মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আমার বিয়ের জন্য। তাদের বোঝালাম, পৃলিমিনারি পাস মানে উকিল হওয়া নয়। উকিল হতে গেলে আরো এক পর্ব শেষ করতে হবে। কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা।
বাবা বললেন, অসুবিধা নেই, তুই তো চাকরি করছিস, মোটামুটি বেতনও পাস। কাজেই বিয়ে করতে অসুবিধা কোথায়?
তারপরও আমি গো ধরলাম, না, উকিল না হয়ে বিয়ে করছি না।
আমার একতরফা সিদ্ধান্তে ফাটল ধরলো। বাবা-মা, ছোট ভাই-বোন এদের সঙ্গে যুক্ত হলো আমার বড় মামা এবং ছোট মামাতো ভাই আলম। এরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে লিপ্ত হলো গভীর ষড়যন্ত্রে। আমার কর্মস্থল চট্টগ্রাম। বাড়ি গিয়ে শুনি আমার বিয়ের জন্য ডজন খানেক ঘটকের নিত্য আগমনের কাহিনী। সুকৌশলে এড়িয়ে গেলাম ঘটকদের। কিন্তু এড়াতে পারলাম না বড় মামা এবং আলমকে।

বড় মামা বললেন, আমার হাতে যে মেয়েটির খোজ আছে, বড় বংশের মেয়ে। ডিগ্রিতে পড়ে। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। আলমের বন্ধুর বোন। তুই বাবা একটাবার দেখে আয়। পছন্দ না হলে তারপর আমাদের বলিস।

অবশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পরাজিত হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম। শর্ত দিলাম, পছন্দ হলে বিয়ে হবে আমার শেষ পর্ব পরীক্ষার পর।

তারা বললেন, আগে দেখে আয়, পছন্দ হলে পরেরটা পরের ব্যাপার।

আমার সম্মতি পেয়ে পরিবারের সবাই আহ্লাদে আটখানা। আলম তো আরো উল্লসিত। ছোটাছুটি বেড়ে গেল তার। খবর চলে গেল কনের বাড়ি। তাদের সম্মতি সাপেক্ষে আমি, আমার বোন এবং বন্ধু-বান্ধব মিলে এক পড়ন্ত বিকেলে কনে দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

সন্ধ্যার আগেই পৌছালাম সেখানে। আমাদের বাড়ি থেকে দূরত্ব পাচ সাত কিলোমিটার। গ্রামের বনেদি পরিবার। কনের দাদা প্রয়াত চেয়ারম্যান। বাবা স্কুল শিক্ষক। বোনদের বললাম, আত্মীয়তা বোধহয় বেশি হাইফাই হয়ে যাচ্ছে রে।

আয়োজন চলছে আমাদের আপ্যায়নের। কিন্তু আমার আসল মানুষ কই? মন ছটফট করছে। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে নাশতার ট্রে হাতে রুমে প্রবেশ করলো সে। পেছনে তার মা। কোনো সাজগোজ নেই। সালোয়ার কামিজ পরা রুচিশীল, মার্জিত চেহারা, গায়ের রঙ শ্যামলা। প্রথম দর্শনেই ভালোলাগার মতো। পরিচয়, আপ্যায়ন শেষে টুকটাক কথাবার্তার পর বিদায়ের পালা। ভদ্রতাবশত আমরাও নিমন্ত্রণ করে এলাম।

তারা জানালো, আগামী পরশু রাতে আসবেন আমাদের বাড়িতে।

বাড়িতে আব্বা, আম্মা বড় মামা আমাকে চেপে ধরলেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না?

জানালাম, পছন্দ হয়েছে।

লাফিয়ে উঠলেন বড় মামা, বলেছিলাম না পছন্দ হবে। হতেই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে তাদের পক্ষ থেকে ছয় সাতজন এলো আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে সেদিন হুলস্থুল আয়োজন। কনের মা, চাচিরা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে আমাদের এ ঘর-ও ঘর। এক পর্যায়ে কি কাজের জন্য কলতলায় গেছি। দেখি অন্ধকারে কনের মা এবং চাচি মিলে আড়ালে ফিশফিশ করে আলাপ করছেন, কেমন দেখলেন?

সব কিছুই ঠিক আছে। শুধু পাকা বাড়ি নেই এটাই সমস্যা।

আমাদের মেয়ে কি এই বাড়িতে এসে মেঝে লেপতে পারবে?

দেখা যাক, ছেলে যদি উকিল হয় তখন দেখা যাবে। ছেলে দেখে আত্মীয়তা করা যায়।

নিজেকে আড়াল করে সরে এলাম ওখান থেকে। পাকা বাড়ি নেই এ অজুহাতে বিয়ে হবে না ভাবতেই নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। ব্যক্তিত্বে ঘা লাগলো আমার। কাউকে কিছু বললাম না। খাওয়া-দাওয়া পর্ব শেষে হাসিমুখে বিদায় জানালাম অতিথিদের। আমার ছুটি শেষের দিকে। চট্টগ্রামে ফিরে যেতে হবে। কাল সন্ধ্যায় রওনা হবো। মনের কথা মনে রেখে বাবা মাকে বললাম যদি কনেপক্ষ আগ্রহী হয় তাহলেই বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলবেন। যেচে তাদের কাছে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। তবে শর্ত হলো, আমার পরীক্ষার পর বিয়ে হবে।

চট্টগ্রামে কর্মস্থলে এলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম পাকা বাড়ি এবং উকিল হয়ে তবেই বিয়ে। আস্তে আস্তে কনে দেখার সব স্মৃতি ভুলে গেলাম। প্রায় তিন মাস পর একটি চিঠি পেলাম। অবাক হয়ে গেলাম চিঠি পেয়ে। এ যে আমার দেখা সেই কনে কৃষ্ণকলির (ছদ্মনাম) চিঠি। আমার কলেজ পড়ুয়া ছোট বোনের কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করে লিখেছে।

চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ। দেখে আসার পর একটা চিঠিও দিইনি কেন? আমি বড় নিষ্ঠুর এবং সবশেষে আমাকে ভালো লেগেছে ইত্যাদি।

আমি বড় বাস্তববাদী মানুষ। ধরেই নিয়েছি ওখানে আত্মীয়তা হবে না। ছেলেমেয়ে বড় হলে এরকম কতো দেখাদেখিই তো হয়। কিন্তু তাদের সবার সঙ্গে কি বিয়ে হয়? হয় না। কোনো উত্তর লিখলাম না। কিন্তু দিন পনেরো পরে আবার চিঠি এলো। এবারও উত্তর দিলাম না। মাস খানেক পর আমার ছোট বোনের একটা চিঠিসহ কৃষ্ণকলির চিঠি পেলাম একই খামে। ছোট বোন অনুরোধ করেছে, ভাইয়া, একটিবার চিঠি দাও। আপু আমাকে পাগল করে ছাড়লো। আমার ঠিকানায় লিখলেই হবে। আমি আপুকে পৌঁছিয়ে দেবো।

নিজের পৌরুষ বিসর্জন দিলাম। চিঠি লিখলাম। উত্তর এলো। এভাবেই তার সঙ্গে আমার পত্র মিতালি গড়ে উঠলো। এটা কি প্রেম? জানি না!

আমার পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এ সময় তাকে চিঠিতে জানালাম তার মা আমাদের বাড়িতে যে কথাগুলো বলেছিল। উত্তর এলো বাংলা সিনেমার নায়িকাদের মতো। আমার প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতা দেখে ক্রমেই তার গভীর পত্র প্রেমে ডুবে যেতে থাকলাম। প্রতি সপ্তাহে আশায় থাকতাম কবে তার চিঠি আসবে। দিন ভালোই যাচ্ছিল।

কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের বাড়িতে জানাজানি হয়ে যায় আমাদের চিঠি লেখার বিষয়টি। শাস্তিস্বরূপ তার কলেজ আসা বন্ধ ছিল দুই মাস। দুই মাস পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং কঠোরভাবে শাসিয়ে দেয়া হয় ভবিষ্যতে যেন তার সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ না হয়। আমার বোন পত্র বাহকের কাজ করে, এ নিয়ে তাদের পরিবার থেকে গালমন্দ করা হয়। অবশেষে দুইজনের মধ্যে পত্র যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়।

তার কাছ থেকে শেষ যে চিঠিটা পেয়েছি তাতে সে লিখছিল, তুমি শেষবারের মতো তোমার মামাকে আমাদের বাড়ি পাঠাও। বাকিটা আমি দেখবো। অনন্যোপায় হয়ে মামাকে অনুরোধ করলাম শেষ চেষ্টা করার জন্য। বড় মামা বিফল হয়ে ফিরে এলেন। তারা সরাসরি না করে দিল। আমাদের পরিবারের জন্য এটা একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। না কথাটি শোনার পর আব্বা আম্মা পরিবারের সবারই মন খারাপ। ওই দিকে কৃষ্ণকলি সরাসরি বিদ্রোহ করে উঠলো তার পরিবারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে উল্টো ফল হলো। তার লেখাপড়াই বন্ধ করে দেয়া হলো চিরতরে। তার অভিভাবকদের এক কথা, আমাদের একটা মাত্র মেয়ে, আমরা তাকে যেখানে বিয়ে দেবো সেখানেই তার বিয়ে হবে। এর বাইরে অন্য কিছু চলবে না।

প্রায় ছয় মাস আমাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। কোরবানির ঈদে বাড়ি গিয়ে শুনি, আমি আসছি জেনে তার ওপর নজরদারি কঠোর করা হয়েছে। ছোট বোন ময়না বললো, ভাইয়া, আপু

খবর দিয়েছে তোমার কাছে যে চিঠি আর ছবি দিয়েছে এগুলো ফেরত দেয়ার জন্য। তুমি তার আশা বাদ দাও।

তার কথা শুনে চুপসে গেলাম। মনটা হাহাকার করে উঠলো। বিশ্বাস করতে পারলাম না কৃষ্ণকলি এ কথা বলতে পারে। আমি বিচ্ছেদের অনলে জ্বলতে থাকলাম।

৯ মে ২০০২-এ সকাল নয়টা অফিসে আমার সামনে একজন দাড়িয়ে। হতবাক আমি, একি সত্যি! নাকি কল্পনা! নাকি স্বপ্ন! হ্যা, একেবারেই সত্যি।

নীলফামারী থেকে সরাসরি বাসে চট্টগ্রাম। সুপারভাইজারকে ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, ওখানে আমার স্বামী চাকরি করে। দামপাড়ায় নামিয়ে দেবেন। অফিসের বিশাল সাইনবোর্ড খুজে পেতে অসুবিধা হয়নি তার। আমার হাত পা কাপতে লাগলো। কি করা যায় এখন?

সহকর্মী সেলিম, ফারুকভাই, পবন, হাসান অভয় দিলেন। পবনদের বাসায় রুনা, মুনার অক্লান্ত পরিশ্রমে ওই দিন দুপুরে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

দেড় মাস চট্টগ্রামে থাকলাম তাকে নিয়ে। এদিকে আব্বা ফোন করলেন, শ্বশুর চিঠি লিখলেন। আমরা উভয় পরিবার তোমাদের বিয়ে মেনে নিয়েছি। তোমরা বাড়ি এসো। আমরা এদিকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।

প্রতিভাপাড়া, নীলফামারী থেকে

পাচটি চাদের ছবি

– আঞ্জুমান আরা আহমেদ

সঠিক তারিখ মনে পড়ছে না। হয়তো সত্তরের শেষের অথবা আশির প্রথম দিকে হবে। যখন ছাত্রীরা ১৪ ফেব্রুয়ারিতে কার্ড আর ফুল দিয়ে ভালোবাসার সম্ভাষণ জানাতে শুরু করলো, ভালোই লাগতো গুরু-শিষ্যের গম্ভীর সম্পর্কের মধ্যে আপন হওয়ার এই হৃদ্যতা। তারা হার্ট আকা ব্যাজ পরতো আর আমাদেরও পরাতো।

আমাদের সময় ভালোবাসা দিবস ছিল না, তাই বলে ভালোবাসা ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। অনেক ছোটবেলায় কিছুদিন একটানা গ্রামের বাড়িতে ছিলাম। আব্বা থাকতেন কলকাতায়। সপ্তাহে অথবা দুই সপ্তাহে গ্রামে আসতেন। আব্বার আসার দিক সকাল থেকেই দোতলায় বসে খালঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম কখন আব্বা আসবেন। কোনোদিন হয়তো দুপুর গড়িয়ে বিকেল শেষে সন্ধ্যা হয়ে যেতো তবুও আব্বা আসতেন না। তখন মনে হতো বুকটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখতাম আব্বার বুকে ঘুমিয়ে ছিলাম। উহ! সে কি আনন্দ। ভালোবাসার সেই প্রথম উপলব্ধি।

বাল্য, কৈশোর, তারুণ্যে আব্বা-আম্মা নয় ভাইবোন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন নিয়ে ভালোবাসার এক আনন্দময় ভুবনে বাস করতাম। সুখ বুঝি কেবল ভালোবাসাতেই পাওয়া যায়।

বিয়ের পর প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ঘরসংসার। কোল জুড়ে ঘর আলো করে সন্তানেরা এলো। সন্তানদের হাসি-কান্না, অসুখ-বিসুখ, পড়াশোনায় ভালো করা, মন্দ করা এ নিয়েও ভালোবাসার এক আশ্চর্য জগৎ।

এতোদিন যাদের ভালোবাসছি তাদের প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। তবুও আজ আমার হৃদয় ভরে আছে আর এক ভালোবাসার। পৃথিবীর চাদ একটি। আমার চাদ পাচটি। তিন বাড়ির বাসিন্দা এরা। কিন্তু আমার কাছে যখন এরা একত্রিত হয় তখন এদের উচ্ছল হাসিতে ঘর আলোকিত হয়। এদের প্রাণবন্ত চাঞ্চল্য ঘর মুখরিত হয়। একটা জায়গাতেই এদের রেষারেষি – *আমরা,* আমার প্রিয় মানুষটি এবং আমি কাকে বেশি ভালোবাসি অথবা তারা কে কার চেয়ে বেশি ভালোবাসে আমাদের।

একদিনের ঘটনা লিখছি। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে কথাবার্তা বলছিলাম বড় মেয়ে, বড় জামাই, ছোট মেয়ে, ছোট জামাই, ছেলে এবং বৌমার সঙ্গে। পাশের ঘরে চাদেরা হই চই করছিল। হঠাৎ করে ঘরে ঢুকলো তারা। সপ্তমী ছুটে এসে নানু নানু করে আমার গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে কোল জুড়ে বসলো। তারপর অন্যান্য চাদের দিকে তাকালো, ভাবখানা আর কে বসবে? তৃতীয়া ফুপুর কোলে বসেছিল। সপ্তমীকে কোলে বসতে দেখে বলে উঠলো, বাণী তুমি বসবে না, দাদিমনি বানী বসবে না, আমি বসবো। আমি বললাম, বেশ তো, তুমি এসো।

তৃতীয়া ফুপুর কোল থেকে নেমে আমার কাছে এলো সপ্তমীকে একটু সরিয়ে কোলে উঠে বসলো। তারপর দ্বাদশের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইয়া তুমিও এসো। দ্বাদশের আর মাত্র দুই মাস বাকি। টিনএজ-এ পা দিয়ে এ বয়সে কি সকলের সামনে নানুর কোলে বসে খায়? লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু তৃতীয়া নাছোড়বান্দা। ভাইয়া এসো না, জায়গা আছে।

অতএব দ্বাদশ এলো, আমার পায়ের কাছে হাটু গেড়ে বসে পড়লো। চতুদর্শী আর ত্রয়োদশী এতোক্ষণ নানাভাইয়ের পাশে দাড়িয়ে ছোটদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এবার কল কল করে উঠলো। তাহলে আমরা বাদ যাই কেন? নাচের ছন্দে চলে এলো। তারা বসে পড়লো দ্বাদশের দুই পাশে। দর্শকরা হাসি মুখে চাদদের দেখছিল।

এবার বড় জামাই উঠে দাড়ালেন। বললেন, বাপি, আপনি আম্মার পাশে বসুন।

প্রিয় মানুষটি আমার পাশের চেয়ারে এসে বসলেন।

একটি শব্দ হলো ক্লিক।

মহাকালের বুকে আকা হলো একটি ভালোবাসার ছবি।

ঢাকা থেকে

– ফৌজিয়া তাবাসুম

মাস্টার্সে ভর্তি হতে গিয়ে চশমা পরা ববির সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। সহপাঠীরা ববিকে আর আমাকে নিয়ে খুব দুষ্টমি করতো। সবাই বলতো, তার সঙ্গে আমাকে খুব মানিয়েছে। ববি সব সময় আমাকে বৌ বৌ ডাকতো। বুঝতাম, সবই মজা করার জন্য।

তাকে একদিন কথায় কথায় বলে বসি, তুমি তো আমায় নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাও না।

কোথায় যাবে বলো?

তুমিই বলো।

ঠিক আছে, সামনের শনিবার বের হবো।

তার কথা মতো বের হয়েছি। ববি ট্যাকসি নিলো। ট্যাকসি বনানীর সামনে গিয়ে দাড়ালো। ছবি দেখতে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি। সে তখন বললো, এখানে তোমাকে নিয়ে এসেছি গল্প করার জন্য। উসখুশ করছি কি গল্প করবো।

সে তার জীবনের গল্প শুরু করলো। রিতা, আমি সকালে দুটো টিউশনি করে চাকরি করছি। বিকেলে আরো দুটো টিউশনি করেছি। চাকরির ফাকে ফাকে ক্লাস করি। গ্রামের বাড়ির পুরো সংসারটা চালাচ্ছি। এখানে ব্যাচেলর থাকি।

সে যখন কথাগুলো বলছিল আমার তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। ববি, তুমি এতো হাসিখুশি ছেলে, তোমায় দেখে মনেই হয় না এতো কষ্ট করো।

এরপর আমার হাত ধরে সে বলেছে, তুমি কি আমায় নিয়ে ভাবো?

তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিইনি।

সে বলেছে একজন ভালো বন্ধু ভালো প্রেমিক হতে পারে।

হ্যা, এরপর ববির সঙ্গে আমার সুন্দর সম্পর্ক হয়। সে সম্পর্কের পরিণতি ভয়ংকর, রোমহর্ষক, বিষাদময়। কিছুদিন এখানে–ওখানে বেড়াতে যাওয়ার পর সে বলেছে তার ব্যাচেলর বাসায় যাওয়ার জন্য। আমি সরল মনে গেলাম সেখানে। তার বন্ধুরা রুম ছেড়ে দিল। ববি জড়িয়ে ধরে কিস দিল। সেই কিসের দাগ এতো প্রবল ছিল যে, দুই সপ্তাহ কলেজে যেতে পারিনি।

সপ্তাহে একদিন ব্যাচেলর বাসায় দেখা করতে যেতাম। একদিন আদর করতে করতে বুকে হাত দেয়। তোমার ও দুটি দেখাও আমায়। প্লিজ, দেখাও না।

না, না বলেও একদিন বাধ্য হয়ে দেখাই।

তোমার ওগুলোতো খুব সুন্দর, খুব সুন্দর।

এভাবে আস্তে আস্তে সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। আবদারের মাত্রা বাড়তে থাকে। সে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে, সমস্ত শরীর কাপতে থাকে। তখন সে নিচের দিকে নামতে থাকে। কোনো বাধাই মানতে চায় না। থাকতে না পেরে কাপড়ের ওপর দিয়ে করে। তার বীর্য সমস্ত কাপড় নষ্ট করে দেয়। এক দিন, দুই দিন করে কতোদিন তাকে বাধা দেবো।

একদিন সে জোর করে কাপড় খোলে। ওপরে ওপরে সঙ্গমে মিলিত হয়। কোনোবারেই আমার ভেতরে সে প্রবেশ করতে পারে না। ববি যখন এ রকম করছে তখন তাকে বলেছি চলো বিয়ে করি।

কিন্তু সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। তার ফ্যামিলিতে বড় দুই ভাই এভাবে বিয়ে করেছে। তার বাবা মেনে নেননি।

মনকে বোঝাতে চেষ্টা করি, সে নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। তা না হলে তার মতো একটা ভালো ছেলে কেন সম্পর্কটাকে এতো দূর গড়াবে!

সে একদিন বলেছে, চলো রাঙ্গামাটি যাই। সকালে যাবো বিকেলে আসবো।

আমার পক্ষে সম্ভব না।

কেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?

যেখানে সব কিছু হয়ে গেছে সেখানে বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে কেন?

খুব ভোরে রওনা হলাম। কারে করে যাচ্ছি। মাথা ঘুরে উঠলো। প্রতি দশ মিনিট পর পর বমি করেছি। যখন বমি করছি, পানির বোতল হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রাণেশ্বর গাড়ি থেমে নেমে যাচ্ছে। শেষে থাকতে না পেরে তার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম। আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। বাথরুমে গিয়ে আবারও বমি করি। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকি। ববি আমার ওপর চড়াও হয়। তাকে সরিয়ে দিই। মনে মনে বলি, আমি অসুস্থ, এমন করো না। কিন্তু তার গোমড়া মুখে হাসি ফোটানোর জন্য মেনে নিই। বুদ্ধিমান ববি মিলিত হওয়ার সময় প্যানথার ইউজ করতো।

সমস্ত শরীর মন জুড়ে ভালোবাসতে বাসতে কিভাবে যে চারটা বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। আমার ভালোবাসার সব কথা লেখা সম্ভব নয়। তাহলে যায়যায়দিনের পুরো পাতা জুড়েই লিখতে হবে। তাকে এতো বেশি ভালোবেসেছি যে, এক সপ্তাহ না দেখে থাকতে পারতাম না। আর আমার জান দৈহিক সম্পর্কে না গিয়ে থাকতে পারতো না। যখন তার বাসায় মানুষ থাকতো তখন তার বন্ধু, এর-ওর বাসায় সে নিয়ে যেতো।

শেষে থাকতে না পেরে তাকে বিয়ের জন্য চাপ দিই। বিষের প্যাকেট হাতে নিয়ে বলি, হয় বিয়ে করবে, নয়তো বিষ খেয়ে মরবো। আমায় প্রিয়তম অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে পারেনি। সে আমার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দেয়। তার বাসায় প্রতিদিন যাই। তাকে পাই না। তার বন্ধুদের একে-ওকে ধরি, কাউকেই পাই না। মোবাইল অফ করে রেখেছে। বন্ধুরা বলছে ববি ঢাকায় গেছে। বুঝতে পারি, বন্ধুরা মিথ্যা বলছে। আদরের ববিসোনা পর হয়ে গেছে।

একদিন সকালে গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তার বাসায় ছিলাম। না, সে আসেনি। কখনো কল্পনা করিনি তার মতো একজন ভালো ছেলে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংসার চালায় সে আমার সঙ্গে এ রকম করবে। একটা মানুষ কতোটা কষ্ট পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কোন পরিস্থিতিতে গেলে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে বুঝতে পারি।

এরপরের কাহিনী বলতে চাচ্ছি না। আমি শুধু এতোটুকু বলবো, আমরা মেয়েরা একুশ শতাব্দীতেও অবহেলিত, খুব বেশি অবহেলিত। আমরা এ রকম মেয়েরা আত্মহত্যা করি, নয়তো বেশ্যা পাড়ায় নাম লেখাই।

আমি তার বন্ধুদের কাছে বাজারের মেয়ে হিসেবে খ্যাত হয়েছি। তাদের সবার পা ধরে বলেছি, হাত ধরে অনুরোধ করেছি, ববিকে এনে দাও। তোমরা আমার ববিকে এনে দাও।

ববি বলেছে, তুই পাচজনের সঙ্গে শোয়া মেয়ে। আমার সঙ্গে যা হয়েছে অন্যদের সঙ্গেও তাই হয়েছে।

আমি কোরআন শরিফ ছুয়ে বলতে পারবো, তুমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্ক হয়নি।
মাথায় কাপড় না দিয়ে কোরআন শরিফ ধরতে চাস?
যার জন্য মন–প্রাণ উৎসর্গ করেছি তার কারণেই আজ আমি সবার কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছি। আমার একটিই প্রশ্ন, সত্যিকারের ভালোবাসা কি পাপ? আমি এখন কাউকেই বিশ্বাস করি না। আমি নোনা জলে বালিশ ভেজাই আর সৃষ্টিকর্তাকে বলি, পাপ যদি করে থাকি আমি একা করিনি, ববিও করেছে। আমি কেন একা শাস্তি পাবো, শাস্তি তাকেও দাও। বিধাতা ধ্বংস করে দাও তার জীবন।
মাঝ রাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, বুকটা হাহাকার করে, মনে হয় মহাশূন্যতার মাঝে বেচে আছি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, ববিকে এনে দাও, তোমরা আমার ববিকে এনে দাও।
পাঠিকারা, কোনো পুরুষকে খুব বেশি ভালোবাসবেন না এবং কুমারী অবস্থায় বিছানায় যাবেন না। কারণ পুরুষরা মেয়েদের শরীর বোঝে, মন বোঝে না।

ঠিকানাবিহীন

সুখস্বপ্ন

– শফিকুল ইসলাম

স্যার, এই চিঠিটা রাখুন।
কি লিখেছো এতে?
কি লিখেছি সেটা যদি মুখেই বলতে পারতাম তাহলে তো চিঠি দেয়ার প্রয়োজন হতো না।
হাত বাড়িয়ে খামটি নিলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে খামের ওপর আমার নাম লেখা। মৃদু পায়ে চলে এলাম বাইরে। বাসায় যাবো। সিমি ক্লাস টেনে পড়ে। সপ্তাহ তিন দিন মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার তাকে প্রাইভেট পড়াই। ছয় মাস ধরে পড়াচ্ছি। পড়াতে তেমন খাটুনি হয় না। সিমি সহজেই সব কিছু বুঝে নেয়। যখন হতাশার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন নীলাদি আমাকে টিউশনিটা পাইয়ে দিয়েছিল। সিমির বাবা নীলাদির খালু। তার খাতিরে সিমির বাবা আমাকে বেতন একটু বেশিই দেন। মাসে পনেরোশ টাকা। রুচিশীল মানুষ। হাতে হাতে টাকা দেন না, খামে ভরে চকচকে তিনটা পাচশ টাকার নোট দেন। স্নেহও করেন পুত্রের মতো।
... হাটতে হাটতে অনকে দূর চলে এসেছি। এখন সিমিদের বাসার কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। পকেট থেকে চিঠিটা বের করে পড়লাম।
তাতে লেখা –

স্যার,
আরেকটু স্মার্ট হতে পারেন না? আপনার সমবয়সী ছেলেরা কতো স্মার্ট, চটপটে। অথচ আপনি...! *রাগ করবেন না। আপনাকে পছন্দ করি বলেই বললাম।*

– সিমি

চিঠিটা দুইবার পড়ে পকেটে পুরে রাখলাম। এই মেয়ে কি জানে, পকেটে টাকা না থাকলে অতি বড় স্মার্ট মানুষও আনস্মার্ট হয়ে যায়? জানে না, জানার কথাও না। তাকে পড়িয়ে পনেরোশ, অন্য দুইটা ছেলেমেয়ে পড়িয়ে ছয়শ মোট একুশশ টাকা আমার মাসিক উপার্জন। এই টাকায় নিজে চলতে হয়, বাড়িতেও পাঠাতে হয়। বাবা অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। মাসে বারোশ টাকা পেনশন পান। আমি কিছু পাঠাই। এভাবে দুলতে দুলতে চলছে সংসার। আমার দুইটা করে শার্ট–প্যান্ট। বছর তিনেক আগের কেনা। একটা শার্টের নিচের অংশ ছিড়ে গেছে। রিপু করে নিয়েছি। কিন্তু রিপুটা এমনই খুব সহজে অপরের চোখে পড়ে যায়। তাই বুদ্ধি করে শার্টটা প্যান্টের সঙ্গে ইন করে পরি। প্রাগৈতিহাসিক এই বেশে নিজের কাছে নিজকেই কেমন বোকা বোকা লাগে। অদৃষ্টকে অভিশাপ দিতে দিতে বাসায় পৌছলাম।

আমার রুমমেট রশীদভাই বললেন, *আরে মাস্টরসাব, আইজ এতো তাড়াতাড়ি যে!*

যদিও আমি তাড়াতাড়ি ফিরিনি, অন্যান্য দিনের মতো পাচটায় ফিরেছি। প্রায় প্রতিদিনই এই লোকটা গৎবাধা এই কথা বলে কি মজা পান তা তিনিই বলতে পারবেন। আমিও প্রতিদিন যে উত্তর দিই সে উত্তরটিই দিলাম।

আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুক্ষণ সিমি আমার আড়াইশ টাকা ভাড়ার বাসায় হাজির। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কথা সরছিল না মুখ দিয়ে।

সিমি দাড়িয়ে থেকেই বললো, আপনাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

বললাম, দেখ, আমার কাজ আছে, তুমি একা যাও।

সে আরেক কাঠি বাড়া। বললো, আপনার কখন কি কাজ থাকে, না থাকে আমি জানি, মিথ্যা বলবেন না।

রুমে রশীদভাইও ছিলেন। তিনি বললেন, *এতো কইরা কইতাছে যান না মাস্টরসাব। আমগোরে তো হালায় কেউ কোনো জাগায় নিবারও চায় না।*

অগত্যা উঠতে হলো। ফয়েস লেকের মনোরম পরিবেশে আমি ও সিমি পাশাপাশি বসে আছি। দুজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর সিমি তার দুই হাত দিয়ে আমার হাত ধরলো। অশ্রু টলমল চোখে বললো, তোমাকে নিয়ে আমি অনেক স্বপ্ন দেখি। আমাকে তোমার সুখ দুঃখের অংশীদার হতে দাও। সিমির চোখে জল দেখে কি যে হয় আমার। রুমাল বের করে পরম যত্নে তার চোখের জল মুছে দিই। এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখলাম। আশ্চর্য এই অসম্ভব ভালো মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে আর আমি তা কখনো বুঝতে পারিনি। অথচ আমি ভুলেও তাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখিনি। ফয়েস লেকের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের লালাভ আভায় পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর, বড় আনন্দময় মনে হচ্ছে।

পাহাড়তলী বাজার, চট্টগ্রাম থেকে

ইজিপশিয়ান আদম

– আতিক

আদমকে হঠাৎ দেখলে *আলাদিনের দৈত্য* বলে ভুল হতে পারে। তার ছয় ফিট দুই ইঞ্চি উচ্চতা আর পেশিবহুল শারীরিক গঠন দেখে অনেকেই দুইবার ফিরে তাকাবে। সঙ্গে টকটকে ফর্শা গায়ের রঙ, মুখে যত্ন করে রাখা দাড়ি-গোফ। পথ ভুলে যদি বাংলাদেশে আদম এসে পড়ে তাহলে পেছনে নারীভক্তের ভিড় সামলানো দায় হবে এটুকু নিশ্চিত। যেমন দেখা যায়, সুদর্শন কৃকেটাররা যখন দেশে খেলতে আসে। অবশ্য আদমকে দিয়ে সব ইজিপশিয়ান পুরুষদের গঠন বিচার করা ঠিক হবে না। উত্তর ও দক্ষিণ ইজিপ্টের জলবায়ু, অধিবাসীদের আকার-আকৃতি, গায়ের রঙ প্রায় বিপরীত।

ইংরেজি আর বাংলায় কিছু দেশের নামে বেশ অমিল লক্ষ্য করা যায় যা একটু অদ্ভুত। যেমন ইজিপ্ট আর মিশর, ইনডিয়া আর ভারত, টার্কি আর তুরস্ক ইত্যাদি।

আদম এই জাহাজের একমাত্র ইজিপশিয়ান। পুরো নাম আদম গরিব। জাহাজে অ্যাসিস্ট্যান্ট কুকের কাজ করে। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারে। তার মূল ভাষা অবশ্য আরবি। কথাবার্তা ইংরেজিতে হয়।

হাসি চেপে একদিন জানতে চাইলাম, আদম, তুমি কি সত্যিই গরিব?

বাংলায় বলাতে সে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বুঝিয়ে বলতেই বললো, আমি টাকার জন্য সমুদ্রে আসিনি। অ্যাডভেঞ্চার আর সমুদ্রের দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে আসে। ইজিপ্টে আমার দুটো অ্যাপার্টমেন্ট এবং দুটো ফিশিং ট্রলার আছে।

প্রথমবার অ্যাসিস্টান্ট কুক হিসেবে কাজ করছে। জাহাজের মেডিকাল ডিপার্টমেন্ট আমাকেই দেখতে হয়। আদম প্রায়ই অনভ্যস্ততার জন্য কাটা হাত নিয়ে হাজির হয়। চিকিৎসার ফাকে ফাকে নানান কথা হয়।

একদিন দেখলাম মনমরা হয়ে আছে। টেলিফোনে লাইন পাচ্ছে না দুই তিন দিন ধরে। বান্ধবীর সঙ্গে দুই তিন দিন পর পর গল্প না করলে তার মাথা গরম হয়ে যায়। ঘুম আসে না। ঘন ঘন মাথার চুল টানছে দেখে হেসে ফেললাম।

বিয়ে করছো কবে জিজ্ঞাসা করাতে আরো বিষণ্ন হয়ে বললো, হুমা-র সঙ্গে আমার বিয়ে সম্ভব নয়। দুই ফ্যামিলির মধ্যে দা-কুমড়া সম্পর্ক। ভবিষ্যতে উন্নতি হবে এমন সম্ভাবনা কম। বছর পাচ আগে আমাদের প্রথম বাগদান হয়। দুই ফ্যামিলির কিছু যৌথ ব্যবসা আছে যাতে ভাগাভাগি নিয়ে রেষারেষি। আমার হবু শাশুড়ি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসাতে প্রভাব বিস্তার করতে চান। আমার পরিবার টের পাওয়াতে বাগদান ভেঙে যায়।

দুই বছর আগে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমাদের দুজনের আগ্রহে আবার বাগদান হয়। হুমা-র মা খুবই লোভী মহিলা। তিনি যতোদিন বেচে আছেন, মনে হয় না আমাদের সম্পর্ক সম্ভব। তিনি আবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হলে আমিই এবার বাগদান ভেঙে দিই। এখন তো দুই পক্ষের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। মাকে ফোন করলেই বিভিন্ন পাত্রীর ফিরিস্তি দেয়া শুরু করেন।

হাসিমুখে বললাম, অসুবিধা কি। *তুম নেহি তো অউর সহি, অউর নেহি তো অউর।*

আদম গলায় ফাস পরানোর ভঙ্গি করে বললো, বিয়ে করলেই শেষ। ফাস খুলতে চাইলে আরো চেপে বসে। উঠতে বসতে পায়ে শৃঙ্খল আছে মনে হয়। আর অপাতত হুমা-কে না ভুলতে পারলে বিয়ে

করা কাউকে প্রতারণার শামিল হবে। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে পুরো সৎ থাকার চেষ্টা করবো। তার উপর এতো টাকা খরচ করে বিয়ে করা!

ভালো যুক্তি, সন্দেহ নেই। বিয়ের খরচ প্রসঙ্গে যা বললো তাতে মনে হলো বাংলাদেশি যুবকদের ভাগ্য ভালো। ইজিপ্টে পাত্রের নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্ট বা ঘর থাকতে হবে যাতে সে সংসার শুরু করবে। পাত্রী তার বাবার কাছে আমানতের মতো। স্বর্ণ, দেনমোহর ছাড়াও কনেকে গড়ে তোলার জন্য একটা নির্দিষ্ট অংক (উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে) পাত্রীর বাবাকে দিতে হয় পাত্রের পক্ষ থেকে। এই পদ্ধতি লিবিয়াসহ আরো বেশ কিছু আরব দেশে প্রচলিত।

এই পদ্ধতির খারাপ দিক হলো, ছেলেদের যোগ্যতা অর্জন করতে যেমন সময় লাগে সুন্দরী না হলে মেয়েদেরও সুপাত্রের সন্ধানে অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে অনেকেরই বাধা–বন্ধনহীন জীবনযাত্রার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

আদমের প্রচুর ফোন বিল আসে। দেখা হতে বললাম, এতো ফোন কাকে করো, হুমাকে?

সে এক চোখ টিপে বললো, আপনার ধারণা আমার শুধু একটাই বান্ধবী?

জিজ্ঞাসা করলাম ইজিপ্টে মেয়েরা কি খুব আধুনিক, মানে সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়?

সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, তা কেন হবে? তবে আপনি একটু খুজলেই যেমন ডায়মন্ড পাবেন তেমনি পাবেন গার্বেজ (আবর্জনা)। উদারপন্থীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রক্ষণশীল পরিবারও আছে। পশ্চিমা ধাচের পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে বোরখার প্রচলনও যথেষ্ট। মূল কথা হলো, কারো সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইলে কখনো এক সপ্তাহ ঘুরলেই হয় আর কখনো বছর লেগে যায়। যতো দেরি হয়, মজা ততো বেশি।

তোমার বুঝি সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?

মুচকি হাসলো আদম।

বুঝলাম ব্যাটা চালু মাল। অনেক ঘাটের জল খেয়েছে।

হুম।

আর হুমার সঙ্গে?

এবার আদমের গলায় কিছুটা আবেগের সুর। বললো প্লেটোনিক বলা যায়। শি ইজ মাই সোলমেট। হাত ধরা পর্যন্তই।

কি অদ্ভুত মনস্তত্ব। প্রেমিকাকে যে সম্মান দিয়েছে, অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা দিতে এতো কুণ্ঠা। এ ব্যাপারটা আমাদের দেশেও আছে। বাইরে বের হলে ইভটিজিং এবং ঘরের মা, বোনের ওপর সতর্ক পাহারা। কেউ কিছু বললে লাঠি নিয়ে তাড়া। অন্য নারীরা তো আর মা বোন নয়, সবাইকে সম্মান দিলে টিজ করবো কাকে?

কৌতূহল মেটাতে জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই বহুগামিতার সাফল্যের রহস্যটা কি? হাসতে হাসতে বললো, যে দেশেরই হোক, মেয়েরা একেকজন হলো একেকটা তালা। দেশি তালা বা জাপানিজ। একটু Tuning–এর দরকার হয়। সঠিক চাবিটা খুজে পেলেই যখন খুশি খোলা, বন্ধ করা কোনো সমস্যা না। মাঝে মধ্যে একটু তেল নিয়ে তালার মতো যত্ন নিতে হয়।

তার দর্শন তত্ত্বেও আমি বিস্মিত।

দুই মাস পর

ইদানীং আদমকে খুব উদভ্রান্ত আর চিন্তিত দেখছি। বেশ কয়েকদিন ইতস্তত করার পর নিচু গলায় একদিন জানালো, একটা সমস্যা হচ্ছে যেটা দিন দিন বাড়ছে।

মেডিকাল রিপোর্ট তৈরির জন্য পরীক্ষা করে দেখলাম বহুগামিতার কুফল। জেনিটাল এরিয়া বড় আচিলের মতো ব্লিস্টারে (ফোস্কা) ভরে যাচ্ছে।

আদম আমতা আমতা করে বললো, প্রটেকশন নেয়া ছিল। তবু কিভাবে হলো বুঝতে পারছি না।

সর্বশেষ

আদম আপাতত চিকিৎসাধীন। প্রতিজ্ঞা করেছে, এবার সুস্থ হলে আর কখনো অবৈধ সম্পর্কে জড়াবে না। মক্কা মদিনায় গিয়ে বিশেষ দোয়া চেয়েছে সুস্থতার জন্য।

তার নতুন মনমানসিকতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছি, আমরা সবাই শুধু ঠেকেই শিখি, দেখে যে কবে শিখবো!

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

সুখী

আমার সম্পর্কটা যার সঙ্গে তার পরিচয় পেলে এ সমাজ কখনোই আমাদের স্থান দেবে না। সব কিছুই আমরা দুজনে খুব ভালোভাবেই জানি এবং বুঝি তারপরও কিছুই করার নেই আমাদের।

তাকে ছাড়া আমি অন্য কিছুই কল্পনা করতে পারি না।সেও তাই।

১৯৯৮-এর শেষ দিক থেকে আমাদের ভালোবাসা আজ পর্যন্ত চলছে। আমাদের দেহ দুটি হলেও আত্মা মনে হয় একটি। এই চার বছরে আমাদের দুটো শরীর কতোবার যে একত্রিত হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এই চার বছরে তাকে ছাড়া আমি এবং আমাকে ছাড়া সে যে কতো অসহায় তা আমরা দুজনে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমাদের সম্পর্ক এ সমাজে প্রকাশ হলে এ সমাজও আমাদের থুথু দেবে। তারপরও আমার সেই মন-প্রাণ-দেহ সপে দেয়া মনের মানুষটির একটি পাগলামি চিঠি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, চিঠির শেষে আমাদের পরিচয় জানানোর পর যারা আমাদের ঘৃণা করবেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আমরা সব বুঝি, অথচ বুঝি না কেন। কিংবা যারা কিছুটা হলেও বুঝবেন তাদের বলবো, মন আসলে অন্য একটি জিনিস যার সাক্ষী আমি এবং আমরা দুজন।

তার চিঠি :

আমার রনির আম্মু,

কেমন আছো, এই প্রশ্নটির উত্তরে ভালো আছি শুনতে পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। কারো মুখে ভালো আছি শুনলেই তার দিকে আমরা এমন ভাব নিয়ে তাকাই যে, হয় সে মিথ্যা কথা বলছে কিংবা তার মাথায় গোলমাল আছে। তাহলে খুব ভালো আছি যারা বলেন তাদের অবস্থাটা কি?

আমার মনে আছে মমতাজউদ্‌দীন আহমদ তার একটি নাটকে *সুখী মানুষ* নিয়ে লিখেছিলেন। ভীষণ অসুস্থ মোড়লকে বাচানোর একমাত্র উপায় একজন সুখী মানুষের জামা জোগাড় করে তাকে পরতে দেয়া। অত্যাচারী ওই মোড়লের জন্য অনেক খুজে একজন সুখী মানুষ ঠিকই জোগাড় করা গেছে। কিন্তু সেই সুখী মানুষের কোনো জামা নেই। সেই মানুষটির জামা নেই বলে তার হারানোর ভয় নেই। আর ভয় নেই বলে সে সুখী। ভালো আছি এ কথাটা বলতেও আমাদের ভয়। এমনকি বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পরেশনের কমিশনাররা তাদের স্ত্রী এবং মহিলা কমিশনাররাও কি ভয়ে নেই? তা না হলে সিটি মেয়র সাদেক হোসেন খোকা তার কমিশনারদের বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য জরুরি মিটিং করবেন কেন? কিংবা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার এই কয়েক মাসে তাদের এতো ভয় কেন? সুতরাং তারাও বলতে পারেন না যে ভালো আছি। তবে শুধু ভয়টাকে জয় করলে বলা যাবে ভালো আছি।

অনেক ঘুরিয়ে-পেচিয়ে লিখলেও তুমি এর মর্মার্থ বুঝতে পারবে। কেননা তুমি প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি মেয়ে। আর দশটি মেয়ের সঙ্গে তোমার তুলনা করা যায় না। একেকজনের ভালো থাকা একেক রকমের। যেমন কেউ ভালো থাকে সবাইকে নিয়ে, কেউ বা একা। ভালো থাকার জন্য কারো চাহিদা বেশি কারো কম। আমার একটা অভ্যাস খারাপ আর তা হলো, আমি যদি দুঃখ পাই, কষ্ট পাই তবে একা নির্জনে, নীরবে থাকতে বেশি পছন্দ করি।

লেখার ছিল অনেক। তবে পড়ার মানসিকতাও তো লাগবে। পরিশেষে একটি গল্প দিয়ে আজকের মতো ইতি টানলাম। আবারও লিখবো। তবে দুঃখ পেলেই লিখবো। ভালো থাকলে নয়, কষ্টে লিখবো।

এক বাসায় দিনে দিনের আলোয়। কাজের ছেলে ছাড়া কেউ ছিল না। তদন্তে এলো পুলিশ কর্মকর্তা। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ছেলেটিকে।

পুলিশকর্তা : ডাকাত কজন ছিল?

ছেলে : স্যার, একজন।

পুলিশকর্তা : ডাকাতটি কেমন ছিল। লম্বা, না বেটে?

ছেলে : দু রকমই ছিল স্যার।

পুলিশকর্তা : সেটা কিভাবে সম্ভব? ডাকাত একজন অথচ তুই বলছিস লম্বা এবং খাটো। ব্যাটা মশকরা করছিস? দেবো তোকে জেলে পাঠিয়ে।

ছেলেটি তখন থতমত খেয়ে কোনো রকমে বললো, আমার কি দোষ স্যার? লম্বা লোকের পাশে দাড়ালে লোকটিকে বেটে মনে হবে আর বেটের পাশে দাড়ালে লম্বা।

সুতরাং আমার ভালো থাকার ব্যাপারটিও এ রকম। বর্তমানে আমার চেয়ে খারাপ আছে এমন লোকের সঙ্গে তুলনা করলে আমি ভালো আছি। এর উল্টো হলে আমি ভালো নেই। তবে উপরের গল্পটি পড়ে যদি তুমি একটু হাসো তবেই আমি সুখী। সব মিলিয়ে সবিনয়ে অনুরোধ, আর যা কিছুই করো না কেন অভিনয় করো না। ভালো আছি খুব ভালো আছি। এ রকম ভালো থাকতে চাই না কখনো কোনোদিনও। ভালো থেকো সব সময়।

ইতি –

তোমার রনির আব্বু।

আমার এই অন্ধ প্রেমিকপুরুষটি আমার সব। কিন্তু আমাদের ভালোবাসার কথা সে আমি আর যাযাদি ছাড়া কেউ জানে না। তাই তো তার অসংখ্য সুন্দর চিঠির মধ্যে থেকে একটি প্রিয় যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যায় প্রকাশিত করে আমাদের প্রেমের সাক্ষী রাখলাম। প্লিজ, আপনারা কেউ তাকে অপবাদ বা ঘৃণা দেবেন না।
কারণ যাকে আমি আমার মন-প্রাণ-দেহ সব উজাড় করে দিয়ে ভালোবেসেছি, আমার গর্ভের প্রথম সন্তান রনির বাবা কেউ নয়, সে আমার আপন চাচা!

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শেষ ভালোবাসা

– মউসিং

পল্লীর শরৎ ঋতুর এক গভীর রাত। সন্ধ্যায় এক পশলা ভারী বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি থেমে গেছে তবুও গাছের পাতার পানি ঘরের টিনের চালে পড়ে টুপটুপ শব্দ হচ্ছে। এই সময় পলাশ ঘুমের মধ্যে কেদে উঠলো। তার মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। পলাশের শিয়রের ছোট কাথা পাল্টিয়ে নিজের বাম হাতের ওপর শুইয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, চুমু দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুম পাড়ালো। কিন্তু পলাশ বা তার মা কেউই জানলো না এই আদর ও চুমুই ছিল শেষ ভালোবাসা।
সিরাজকাকা আমার বাবার কাছে প্রতিদিন সকালে ম্যাথমেটিকস শিখতো। সেই সুবাদে সিরাজকাকার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সে বছর কুরবানির ঈদের দিন রাতে সিরাজকাকার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। বর্ষার মরসুমের গ্রামের কোয়ার্টার কিলোমিটার কর্দমাক্ত রাস্তা পেরিয়ে মাগরিবের সময় সিরাজকাকার সঙ্গে তার বাড়িতে পৌছালাম। সেখানেই মিনিফুপুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মিনিফুপু সিরাজকাকার ছোট বোন।
পলাশের বাবা কোনো এক গাড়ি দুর্ঘটনায় গত বছর মারা যাওয়ার পর থেকে বাবার বাড়িতে মিনিফুপু থাকতেন। মিনিফুপু আমাদের খুবই আদর করে পেট পুরে খাওয়ালেন। তার ছোট ছেলে পলাশের সঙ্গে খেলা করলাম। ছেলেটির চেহারা ছিল এমনই মায়াময় যে, প্রথম দেখায় আদর না করে থাকা যেতো না। বলা যায় ছেলেটি ওই বাড়ির সবার কোলে কোলে থাকতো। পলাশ কেবল গোসল, খাওয়া ও ঘুমের সময় মায়ের কাছে আসতো। এসব কথা মিনিফুপুর কাছে খাবার খেতে খেতে শোনা।
আশির দশকের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ থেকে ব্যাঙ রফতানি হতো। আমাদের গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা রাতে ব্যাঙ নিধন করতে করতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, ঝোপ-জঙ্গলে সাপ খাবার না পেয়ে মানুষের ঘরে খাবার খুজতে আসতো। ঘটনা সে সময়েরই।

সিরাজকাকার বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর প্রায় দুই মাস হয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে না গেলেও সিরাজকাকার কাছ থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালে তার বোন ও ভাগ্নের খবর নিতাম। এমনই এক সকালে খবর পেলাম মিনিফুপুকে রাতে সাপে কেটেছে এবং সে খুবই অসুস্থ।

বাবার সঙ্গে মিনিফুপুর বাড়িতে বেলা দশটা নাগাদ পৌছে দেখলাম ফুপু অজ্ঞান হয়ে গেছেন এবং কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে। ফুপুর মায়ের কাছে শুনলাম গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে টয়লেট সারতে খাট থেকে নামতেই পায়ে সাপ কামড় দিয়েছে। সারা রাত ব্যথায় কাতরিয়েছে, সকালে ধীরে ধীরে মুখের জবান বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। স্থানীয় ওঝা বহু চেষ্টা করেছে, ফল হয়নি। সিরাজকাকা গেছেন শুক্কুর ওঝাকে আনতে, পলাশকে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ির কোনো এক ছেলে। ঘর ভর্তি লোকজন নানান কথা বলছে, ওমুক ওঝা এলে ভালো হতো, ওমুক ওঝা সাত দিনের মরা ভালো করতে পারে।

দুপুরের পর শুক্কুর ওঝা এলো এবং নানান ঝাড়–ফুক করলো। কোনো কাজ হলো না। শেষে দেখা গেল মিনিফুপুর মাথার চুল টান দিলে উঠে আসছে, চোখ–মুখ কালো হয়ে গেছে। নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না। শুক্কুর ওঝা ঘোষণা করলো তার পক্ষে আর চেষ্টা করা সম্ভব না। রোগী বেচে নেই। হঠাৎ যেন কান্নার তীব্রতা বেড়ে গেল। এতোক্ষণ যারা আশায় বুক বেধে ছিল তারাও কেদে উঠলো। কান্নার শব্দ শুনে পলাশকে নিয়ে ওই ছেলে চলে এলো। তাছাড়া ক্ষিধেয় পলাশ মা মা করে কান্নাকাটি করছিল। ওই ছেলেটি পলাশকে এনে কোনো এক মহিলার কাছে দিলে তিনি পলাশকে কিছু খাবার খাইয়ে কান্না থামিয়ে ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে ছেড়ে দিলেন। পলাশ তার মায়ের লাশের রুমে খেলতে খেলতে বারে বারে যাচ্ছে তার মায়ের বুকের কাপড় খুলে দুধ খাওয়ার জন্য।

পলাশের নানি এক সময় বললেন, ওরে! ওকে ছেড়ে দে...! শেষবারের মতো তার মায়ের আদর–ভালোবাসা পলাশ নিজেই আদায় করে নিক।

এক সময় পলাশকে ছেড়ে দিলে পলাশ তার অভ্যাসবশত মায়ের একটি হাত সরিয়ে সেই হাতের ওপর স্তন নাড়াচাড়া করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। সেই দৃশ্য ছিল করুণ। বর্ণনাতীত। একটি শিশু সন্তান তার মায়ের কাছে যে কতোটা নিশ্চিত নিরাপদ বোধ করে তা পলাশের গভীর ঘুম দেখে বুঝলাম।

পলাশ যতোক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল ততোক্ষণ ওখান থেকে সরিয়ে নেয়া হলো না। কিন্তু তাতে সমস্যা হলো ওই হাতটি আর সোজা হলো না। ততোক্ষণে পলাশের মায়ের লাশ শক্ত হয়ে গেছে। পলাশের বানানো ভালোবাসার শয্যা যেন পরজনমের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল। কেননা এ মায়ের হাত। এ হাত নিখাদ ভালোবাসার হাত। এ হাত পরম স্নেহের হাত। এ হাত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণের হাত।

লাশ কাফন পড়ানোর পর ওই হাতটি ওইভাবে বাকা অবস্থায় দাফন করা হয়। লাশ দাফন করতে যাওয়ার সময় পলাশ কান্নার বদলে হেসে হেসে হাত তালি দিচ্ছিল। হয়তো ভাবছিল ওর মা বেড়াতে যাচ্ছে, ও যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

পলাশ সেদিন তার মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু পলাশকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। শুনেছি তার মায়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পর বিভিন্ন রোগে ভুগে একদিন পলাশ তার মায়ের ভালোবাসার নীল হাতে শোবার জন্য চলে গেছে।

উলন রোড, পশ্চিম রামপুরা ঢাকা থেকে

বদলি

– ইমরান হোসেন তালুকদার

সবেমাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। চোখে রঙিন স্বপ্ন। ছাত্র হিসেবে কখনো খারাপ ছিলাম না। সেই সুবাদে ভবিষ্যতেও ভালো রেজাল্ট হবে সেই আশা বুকে লালন করছি। ভর্তি হয়েছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যা বিভাগে। সারাদিন ক্লাস, প্র্যাকটিকাল, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা সব মিলিয়ে খুব খারাপ কাটছিল না। তারপরেও মনের মধ্যে কেমন যেন খা খা করতো। সব সময় কল্পনা করতাম একজন সঙ্গিনীকে। কিন্তু মনের মতো কাউকে পাইনি।

বাবা সরকারি চাকরি করতেন, সেই সুবাদে মাঝে মধ্যেই বাবা বদলি হতেন। আমার প্রেম না হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ।

একদিন চিঠি পেলাম, বাবা খুলনা বদলি হয়েছেন। তখন আমার পরীক্ষা চলছে আর এটি আমার কাছে নতুন কিছু নয়। বাবাকে জানিয়ে দিলাম, পরীক্ষা শেষে খুলনা আসছি।

পরীক্ষা শেষে নতুন বাড়িতে গেলাম। বড় গেট, ভেতরে সুন্দর বাগান আর গারাজসহ দশ কাঠা জমির ওপর চমৎকার দোতলা বাড়ি। উপরে বাড়িওয়ালা আর নিচে আমরা। বাড়িটি আমার খুব পছন্দ হলো।

পরের দিন সকালে বাবা অফিসে, ভাই-বোনেরা স্কুলে, শুধু আমি আর মা বাড়িতে। মা বাড়িওয়ালার খুব প্রশংসা করলেন। অত্যন্ত ভদ্র মানুষ, খুব দায়িত্ববান, আমাদের কখনো কোনো অসুবিধা হতে দেন না ইত্যাদি। তারপর মা একটি কাজে আমাকে উপরে পাঠালেন। কলিংবেল টিপতেই লম্বা চুল, সুন্দর চোখ, শ্যামলা চেহারার একটি মেয়ে দরজা খুললো। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

মেয়েটি রাগত স্বরে বললো, কি চাই?

বুঝলাম অবস্থা খারাপ। তাই ঝটপট নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি আবির। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যা বিভাগে পড়ালেখা করছি নিজেকে পদার্থ বানানোর জন্য। আর আপনাদের পায়ের নিচে থাকি।

এ কথায় মেয়েটি হেসে বললো, তাহলে আপনি এখন অপদার্থ?

পরের দিন মেয়েটির সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে আবার দেখা। খুব সাহস করে বললাম, আপনার পরিচয়টা জানা হয়নি।

মেয়েটি কৌতুক করে বললো, আমি প্রজ্ঞা। কলেজে পড়ি। ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স। আপনাদের মাথার ওপর থাকি আর বাড়িওয়ালার একমাত্র কন্যা।

কয়েকদিন পর উপর তলার খালাম্মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। এরই মধ্যে প্রজ্ঞাদের বাড়িতে আমি বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছি। অনেক কথা বলার পর তিনি খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বললেন, আমি যেন প্রজ্ঞাকে গণিত আর পদার্থবিদ্যাটা দেখিয়ে দিই।

এ প্রস্তাবে আমি মহাখুশি। তারপরেও নিজেকে সামলে নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলাম, আমার এখন ক্লাস শুরু হবে। দুই এক দিনের মধ্যেই চলে যাবো। তবে গরমের ছুটিতে এসে দেখিয়ে দেবো।

রাজশাহী এসে খেয়াল করলাম আমার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। আমার আর রাজশাহী ভালো লাগছে না। কোনো রকমে গরমের ছুটি পর্যন্ত থেকে বাড়ি চলে এলাম এবং প্রজ্ঞাকে দেখাতে শুরু করলাম।

এক সময় আমাদের প্রেম হয়ে গেল। এভাবে দুই বছর কাটলো।

কিন্তু বিধি হলো বাম। আমার একটা চিঠি প্রজ্ঞার মা পেয়ে যান এবং বাড়িতে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেন। পনেরো বিশ দিন প্রজ্ঞার কোনো চিঠি না পেয়ে খুলনা চলে গেলাম। ঢুকতেই দেখি দোতলার বারান্দায় প্রজ্ঞা দাড়িয়ে। উস্কো-খুস্কো চেহারা, আমাকে দেখে চমকে উঠে প্রজ্ঞা ভেতরে চলে গেল। বাসায় ঢুকতেই দেখি সবাই গম্ভীর।

রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যাবো এমন সময় মা দরজা বন্ধ করে বললেন, দেখ আবির, তোকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা। তোর কি ধারণা, আমরা তোকে খাওয়াতে পারবো, পড়াতে পারবো আর বিয়ে দিতে পারবো না? ওই কালো মেয়েটার ভেতর তুই পেলিটা কি? আজ সকালে ওই ডাইনির বাপ তোর বাবাকে যা ইচ্ছা তাই বলে গেল। এক মাসের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে গলা ধরে বের করে দেবেন। শুধু তোর জন্য তোর বাবাকে এতো বড় কথা শুনতে হলো। বলে মা কাদতে কাদতে চলে গেলেন।

প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে রাত কাটলো। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এই ভালো মানুষ বাবাটার জন্য।

সকালে খাবার টেবিলে বাবা বললেন, আমি আর চাই না তুই এখানে থাকিস। কাল সকালেই তুই চলে যা।

দুপুরে আমি আর মা বাসায় আছি এমন সময় প্রজ্ঞাদের কাজের ছেলেটি আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। তাতে প্রজ্ঞা লিখেছে –

আবির,

আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। কিন্তু তোমাকে হারাতে পারবো না। তুমি চলে যাও। না হলে বাবা তোমাকে মেরে ফেলবেন। – প্রজ্ঞা

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে পরের দিন রাজশাহী চলে এলাম।

আসার সময় শেষবারের মতো প্রজ্ঞার চোখে পানি দেখে এসেছিলাম। দিন সাতেক পর মায়ের চিঠি পেলাম। বাবার বদলি হয়েছে। তাকে গলা ধরে বের করে দিতে হয়নি।

কাজলা, রাজশাহী থেকে

জীবন্ত লাশ

– সাজিয়া

আমার বড় চাচার ছেলে মহসিনভাই। বংশের বড় এবং খুবই নম্র, ভদ্র ছেলে ছিলেন। তাই সবার স্বপ্ন ছিল তাকে নিয়ে। কিন্তু সেই ভাইয়া যখন সবাইকে না জানিয়ে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ভালোবেসে বিয়ে করলেন তখন ফ্যামিলির সবাই হতবাক হয়ে গেল। কারণ ভাইয়া যাকে বিয়ে করেছেন সেই মেয়ে মানে ভাবী আমাদের দূরসম্পর্কের ভাগ্নি এবং বয়স ছিল বিশ। ভাবীর বাবা-মা আমাদের ফ্যামিলির মুরুব্বিদের চাচা-চাচী বলে।

চারদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সবাই আজেবাজে কথা বলা শুরু করলো। আমার বড় চাচি এই শোকে অনেক দিন অসুস্থ ছিলেন। কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না। কিন্তু আমার বড় চাচা হলেন খুবই ভালো মানুষ। তিনি ফ্যামিলির বিপক্ষে থেকে ভাবীকে মেনে নিলেন। তার জন্য ভাবীকে কেউ মন্দ কথা বলেনি। শুধু ভাবীর বাবা তাকে মেনে নিতে পারেননি এবং তিনি বললেন, যদি কোনো রিকশাচালককে বিয়ে করতে, খুশি হতাম। তবে মা, তুমি এই অসম সম্পর্কের বিয়ে কি করে করলে? ভাবী সেদিন কোনো উত্তর দিতে পারেননি। কারণ ভালোবাসা কোনো কিছু মানে না। সময় বয়ে গেল। এভাবে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে ভাবী পুত্র সন্তানের মা হলেন। এবার আমার বড় চাচি তাকে কিছুটা মেনে নিলেন।

২০০০ সালের জানুয়ারিতে আমার এই ভাইয়াকে সন্ত্রাসীরা সাড়ে তিন লাখ টাকাসহ কিডন্যাপ করে এবং কয়েকদিন আটকে রেখে মেরে ফেলে। থানায় জিডি করা ছিল। তাই মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশরা আমার চাচাদের জানায়। তার খবর পেয়ে লাশ এনে দাফন করে। আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ একটি দিন গিয়েছিল সেদিন এবং আমাদের পুরো ফ্যামিলি আরেকবার নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ ভাইয়া বিয়ে নিয়ে অপকর্ম করেছেন ঠিকই কিন্তু ছেলে হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। কেন তার মৃত্যু হলো?

সেই থেকে আমার বড় চাচি অসুস্থ হলেন। আজও তিনি অসুস্থ এবং প্রায়ই হাসপাতালে তাকে ভর্তি করতে হয়। আর বড় চাচাকে বুড়ো বয়সে সংসারের বোঝা বইতে হচ্ছে।

আর ভাবী ভালোবেসে বিয়ে করে দিয়েছেন চরম মূল্য। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সবার ধিক্কার নিয়ে এবং আবার মাথা নিচু করে বাবার বাড়ি চলে গিয়ে হয়ে গেছেন জীবন্ত লাশ।

সেই জীবন্ত লাশের দিকে তাকানো যায় না।

নারিন্দা, ঢাকা থেকে

দৈহিক

– আলম

তার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য প্রায় চার। তিন সন্তানের মা। বড়টা নাইনে। মেজটা সিক্সে। ছোটটা কেজি ওয়ানে পড়ে। স্বামী-সংসার সবই ছিল। তারপরও প্রচণ্ড অভাবী মনে হতো। সে অভাবের ধরনটা বুঝতে পারিনি প্রথম। আমি তখন বয়সের দুষ্ট সময়ের দুয়ারে। চোখের দেখায় কি ছিল জানি না। ভুল কিংবা শুদ্ধ কোনোটাই তখন আমার কাছে মুখ্য নয়। আমি ডুবতে শুরু করে দিয়েছি।

হঠাৎ একদিন কারেন্ট চলে যাওয়ায় বাইরের গেটে দাড়িয়ে আছি। পরক্ষণেই দেখলাম তাকে। ঠোটের ছলকানিতে ভড়কে গেলাম। ভয় করছে। কাপছি আমি। এরপরও সাহস করে তার উন্মুক্ত মসৃণ পেটে হাত দিলাম। সে একটুও সরলো না, প্রতিবাদও করলো না। শুধু বললো, কেউ দেখে ফেলবে।
বললাম, অন্ধকারে কে দেখবে? পরে তার উরুতে হাত দিলাম।
সে বললো, ছাড়ো।
ওই দিন রাতে আর চোখে ঘুম নেই। ছটফট করে শেষ রাতে চোখে ঘুম এলেও পানির ছিটাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম তাকে। রাত তখন সাড়ে তিনটা। দরজা খুলে বের হয়ে জাপটে ধরলাম। চুমু খেলাম। কোনো মেয়েকে প্রথম চুমু। এভাবে প্রায় রাতে এ কাণ্ড ঘটে চললো।
প্রায় সপ্তাহ খানেক পর এক রাতে আমার জানালার পাশে এসে ডাক দিল। সবাই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। হাত ধরে নিয়ে গেল তার ঘরের সামনে। ফিশ ফিশ করে বললাম, ঘরে কে আছে?
বললো, শুধু বাচ্চারা।
টেনে নিয়ে গেল ঘরে। জাপটে ধরে বললো, আমাকে শেষ করে দাও। আমি আর পারছি না।
বুঝে উঠতে পারছি না কি করবো। যৌবনের ধাক্কা, সামনে প্রমত্ত যৌবনা নারী।
আমার সিদ্ধান্তের জন্য সে অপেক্ষা করলো না। মুহূর্ত দেরি না করে আমাকে শুইয়ে প্রবিষ্ট হলো আমার ওপর। শারীরিক সম্পর্ক এই প্রথম। ফেল মারলাম। শেষে জোর করেই তার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ছাড়তে চাইছিল না সে। ভাগ্য ভালো কেউ দেখে ফেলেনি।
পড়ে গেলাম মহাতাণ্ডবে। শেষমেষ বিবাহিত মেয়ের সঙ্গেই? কি বলে একে? পরকীয়া?
ডেট করলাম তার সঙ্গে কোনোদিন নৌকায় করে, কোনোদিন বাসে চড়ে বহু দূরে। আমার যেতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে সে যে অসুবিধায় পড়তো তা মনে হতো না। বেশ কয়েক মাস এভাবে চললো। তার ছেলেমেয়েরা ঘটনার কিছুটা আচ করতে পেরেছে বলে নিজের কাছে মনে হলো। স্বামীও হয়তো বা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। কারণ সে ছিল অক্ষম। তার স্ত্রী যে যৌন ক্ষিধেয় কাতর ছিল সেটা সে বুঝতে পারলেও তার করার কিছুই ছিল না।
চোরের দশ দিন, পুলিশের একদিন। ধরা পড়ে গেলাম। এবং সেটা আর কারো কাছে নয় নিজের মায়ের কাছে।
ঘরের মধ্যে এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য হওয়ায় ভয়ে চুপসে গেলাম। তারা ছিল ভাড়াটিয়া। ছাড়তে হলো বাসা। আমারও মন খারাপ। তারা কোথায় যাচ্ছে সেটা জানতে পারছি না। যাকে বলে পাপ। তারা যে বাসায় গেল তার ঠিকানা খুজে পেতে বেশি সময় লাগেনি। পাপের ওজনও বাড়িয়ে চলেছি আমি। একদিন সেখান থেকে তারা আবার কোথায় যে গেল তার ঠিকানা আর পেলাম না। শেষে তার মেয়ের স্কুলে গিয়ে যোগাড় করলাম ঠিকানা।
এমনি করে বছর পার করলাম। অনেক দিন ইচ্ছা করেই কোনো যোগাযোগ রাখিনি। মনে পড়লো তাকে। গেলাম। গিয়ে দেখি চুপচাপ বসে আছে।
নিজেই বললো, স্বামী মারা গেছে।
কবে?
বায়ান্ন দিন আগে।

সাহস করেই বললাম, এবার কি করবে?

সরল উত্তর, দেখি।

এরপর অনেক দিন তার বাসায় যাইনি। পরে তারা সে বাসা ছেড়ে দিয়েছিল। টেলিফোনে কথা হলো অনেক দিন পর। দেখা হলো। তার দুঃখের কাহিনী শুরু করলো। স্বামীকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে পারেনি। দেবরকে স্বামীর আসনে বসিয়ে যৌবন বিলিয়ে দিতে একটুও দেরি করেনি। ভাইয়ের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে চতুর দেবর ভাবীর স্বেচ্ছাচারিতার বদৌলতে বিনা বাধায় ভোগে মেতে উঠলো। স্বামীর দেহে রোগের বাসা। চিকিৎসার ব্যাপারে দারুণ অনীহা। শেষে ইহত্যাগ, দেবর চান্সে ছিল। ভাইয়ের ব্যাংক ব্যালান্স, পেনশন, জায়গা ভাবীকে ছল করে সেগুলো যদি আয়ত্ব করা যায়। আশ্বাস দিয়েছিল তাকেই জীবন সঙ্গিনী করবে। কিন্তু হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেললো অন্য মেয়েকে। এ চাতুরি মেনে নেয়ার মতো মানসিকতা তার হয়ে উঠছিল না। ঘৃণা জমতে শুরু করলো পুরুষ জাতির ওপর।

বললাম, আমিও তো পুরুষ। আমিও তো তোমাকে ঠকিয়েছি।

না না, তুমি ঠকাওনি। আমিই তোমাকে ঠকিয়েছি। তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। বললো সে। তবে সে ভালোবাসা শুধুই ভোগের। না স্বামী, না দেবর, কেউই সুখ দিতে পারেনি। তুমিই আমাকে সুখের সাগরে ডুবিয়েছিলে। চেষ্টাও করেছিলাম তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। তুমি ভীতু, সাহস ছিল না তোমার। সাহস থাকবেই বা কেন? একটা বিবাহিত মেয়েকে একটা অবিবাহিত ছেলে কেন বিয়ে করবে? ভোগের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যৌবন এক রোগের নাম। আমার ছিল সে রোগ। নিজে রোগী হয়ে অন্যকেও সে রোগে আক্রান্ত করেছিলাম বলেই আমার এ দশা। এখন আমি কি করতে পারি উপায় বলে দাও। সে কথাগুলো বললো, এক নিঃশ্বাসে।

মনে মনে ভাবছিলাম আমি কোন গোলকধাধায় পড়েছিলাম। তাকে কি আমি ভালোবেসেছিলাম? একজন ভালোবাসতে চায়, আরেকজন সে সুযোগে ভোগে মত্ত হয়ে পড়ে। শেষে স্বীকার করলো আমাকে সে ভোগ করার জন্যই ভালোবাসার অভিনয় করেছে।

বললাম, ভুল যা হবার হয়েছে। শুধরে নেয়ার এখনো সুযোগ আছে। মওকা পেলে গুণধর দেবরকে জিজ্ঞাসা করো যে, নিজের স্ত্রীকে সে সুখী করতে পারছে কি না।

দৈহিক ভালোবাসা লোভের ক্ষেত্র। আর লোভে আছে পাপ, আছে প্রতারণার সুযোগ। যার শিকার আমরা হরহামেশা হচ্ছি। এবং তা নিজেদেরই অজান্তে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কিন্তু

– সোহেল এফ রোজারিও

২০০১ সালের ১২ অক্টোবর। বিশেষ কাজে বোটে করে (ইঞ্জিনযুক্ত নৌকা, স্থানীয় ভাষায় যাকে বোট বলা হয়) বাড়ি যাচ্ছি। প্রায় দেড় ঘণ্টা জার্নি। তাই একটু জায়গা নিয়ে বসে গল্পের বই পড়া শুরু করলাম। ইতিমধ্যে বোট চলা শুরু করেছে। গল্পের বই থেকে হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই দেখি রূপসী একটি মেয়ে। তাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় খুজে পেলাম না। আমার কাছে মনে হলো তার তুলনা শুধু সে-ই। তার সঙ্গে একজন মহিলাকে দেখলাম। ধারণা করলাম তার মা। গল্পের বই রেখে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছি। যতোই দেখি ততোই দেখার স্বাদ জাগে। সেও আমার অভিসন্ধি বুঝে ফেলে। দুজনে দুজনার চোখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। চোখের ভাষায় তাকে জানিয়ে দিই আমার ভালোবাসার কথা, সেও নীরব সম্মতি জানায়। ইশারায় জানিয়ে দেয় সঙ্গে মা, তাই সাবধান।

এরই মধ্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌছে গেলাম। কখন যে দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেল টেরই পেলাম না। তাড়াতাড়ি একটা কাগজে আমার ঠিকানা লিখে তার হাতে গুজে দিয়ে শুধু বললাম, চিঠি দিও।

গ্রামে গিয়ে কিছুতেই তার কথা ভুলতে পারলাম না। শয়নে, স্বপনে শুধু তারই মুখখানি চোখে ভাসে। তার হাতের কোমল স্পর্শের কথা মনে পড়লেই হৃদয়টা এক ভীষণ ভালোলাগায় ভরে যায়। সে এক অব্যক্ত অনুভূতি।

গ্রামে দুদিন কাটিয়ে ঢাকা চলে আসি। প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকি নাম না জানা মেয়েটির চিঠির। কবে আসবে তার চিঠি? পড়াশোনায় মনোযোগ নেই, সারাক্ষণ এক গভীর স্বপ্নের জগতে ডুবে থাকা।

হঠাৎ একদিন ডাক পিয়ন এস হলুদ খামের একটি চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি পড়ে বুঝলাম সেই মেয়েটির চিঠি যে আমার হৃদয়ের সবটুকু কেড়ে নিয়েছে। নাম কেয়া, এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী।

শুরু হলো আমাদের ভালোবাসার পথ চলা। তবে কেবল চিঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলাম। কেননা সে গ্রামে থাকে আর আমি শহরে।

কয়েকদিন পর ভালোবাসা দিবস। কেয়া চিঠিতে জানালো, আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি সে ঢাকা তার মামার বাসায় আসছে। তার মামা নাকি কি বিশেষ পরিকল্পনা করে রেখেছে। আমি তো বেশ খুশি, তার সঙ্গে দেখা হবে। ঠিক করলাম ১৪ তারিখ আমরা দুজনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবো। দেখতে দেখতে ১৪ ফেব্রুয়ারি এসে গেল। আগের কথা অনুযায়ী আমরা সারাদিন রমনা পার্ক, শিশু পার্ক, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, লালবাগের কেল্লাসহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। তাকে বললাম, আমি বিধর্মী একটি ছেলে তুমি কিভাবে আমাকে গ্রহণ করবে।

সে বললো, আমার কাছে ভালোবাসাই বড়, ধর্ম নয়।

দুজনে হাতে হাত রেখে কথা দিলাম শত দুঃখ-কষ্টেও দুজনে অটল থাকবো। সন্ধ্যায় তাকে বাসার গেটে পৌছে দিয়ে হলে ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে হঠাৎই কেয়ার ফোন। সে যা বললো তা শুনে আমার পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলাম তার মামার বাসার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দারোয়ান কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। তখন ২০ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এই চিঠিটা নিয়ে কেয়াকে দিন। কতোক্ষণ পরেই ফিরে এসে কেয়ার একটি চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিতে লেখা, আমাকে বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছে না। আমাকে উদ্ধার করো। আরো

৫০ টাকা সঙ্গে একটি চিঠি কেয়াকে দিতে বলে চলে এলাম। চিঠিতে লিখলাম রাত একটায় আসবো। প্রস্তুত থেকো।

নির্দিষ্ট সময় প্রাচীর পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখি একজন বেশ মোটা-সোটা লোক হাতে টর্চলাইট নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বললো এসো বাছা, আমি প্রস্তুতই আছি। প্রেম করার শখ আজ বের করবো। এ কথা বলেই হাতের চর্টলাইট দিয়ে পেটাতে লাগলো আর চোর চোর বলে চিৎকার করতে লাগলো। হঠাৎ মাথার পেছনে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগাতে জ্ঞান হারালাম।

পরের দিন জ্ঞান ফিরলে চেয়ে দেখি আমি থানায়। একজন পুলিশ এসে বললো, যা বাসায় যা, তোর পকেটে যা ছিল তাতেই আমাদের হয়ে গেছে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটি টাকাও নেই। কোনোমতে হলে ফিরে এলাম। এই ঘটনার কয়েকদিন পর সেই দারোয়ান এসে হাজির। তার মুখে সব শুনলাম।

সেদিন তার হাতে চিঠি দিয়ে আসার পর কেয়ার মামার হাতে ধরা পরে যায়। তাই আমি সরাসরি কেয়ার মামার হাতে ধরা পরি। সেদিন রাতে মিথ্যা চোর বানিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার পর সে কেয়াকে সব খুলে বলে। কেয়া এই কথা শোনার পর পরের দিন নাকি একফোটা পানিও স্পর্শ করেনি। অবশেষে ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখ কেয়াকে জোর করে এক প্রবাসী পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। এর তিন দিন পরেই কেয়াসহ তার স্বামী বিদেশে পাড়ি জমায়। কেয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার মামার সঙ্গে নাকি একটা কথাও বলেনি।

সব শুনে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সব দুঃখ ব্যথাকে ছুড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম।

ঢাকা থেকে

সন্ন্যাসী

– সিরাজুল ইসলাম

সেদিন মানে শুক্রবার তোমাদের ওখানে ঢুকে অবাক হলাম। কারণ তুমি আমাকে দেখে দৌড় দাওনি। বুঝলাম, লক্ষ্য করোনি। তারপর অপেক্ষায় ছিলাম তোমার দৌড় দেখার জন্য। এবং ঠিক তাই করলে চেনামাত্র।

এজন্য তোমাকে চিঠি না লিখে পারছি না মাঝে গল্পটা না বলে। দুই সন্ন্যাসীর গল্প :

দুই সন্ন্যাসী চলেছেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। খুব বৃষ্টি হয়েছে কয়েকদিন। চারপাশে জল-কাদা, ডোবা-খানা-খন্দ। সন্ন্যাসী দুইজন চলছেন। পেছনে আসছিলেন এক সুন্দরী যুবতী, তেমনি তার সাজ পোশাক। সামনেই প্যাচ প্যাচে কাদা।

যুবতী ইতস্তত করছেন। ওই কাদায় নামলে শাড়ি, জুতো সবই যাবে। তার ইতস্ততা দেখে এক সন্ন্যাসী এগিয়ে গেলেন। যুবতী কিছু বলার আগেই কোলে তুলে তাকে কাদার অংশটুকু পার করে

দিলেন। আবার তারা চলতে শুরু করলেন। হাটতে হাটতে তারা পৌছালেন এক মঠে। রাত হলো। দুজনেই শুয়েছেন এক ঘরে।

হঠাৎ দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বললেন, পরমানন্দ, তুমি এটা কি করলে?

কোনটা? প্রথম সন্ন্যাসী বললেন।

তুমি তো জানো, আমাদের মতো সন্ন্যাসীদের নারী দর্শনেও চিত্ত চঞ্চল হতে পারে। স্পর্শ! সে তো আরো ভয়ংকর। আর তুমি সেই যুবতীকে কোলে করে কাদা পার করালে! কাজটা কি ভালো হলো?

পরমানন্দ হাসতে হাসতে বললেন, হায় হরি! আমি তো তাকে কখন কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি। আর তুমি এখনো তাকে বয়ে বেড়াচ্ছো!

আমিও তো কবেই তোমাকে নামিয়ে দিয়েছি। তারপরও এখনো আমাকে বয়ে বেড়াচ্ছো?

খালিশপুর থেকে

সতর্কবাণী

বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা যে কতোভাবে ধর্ষিত ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার প্রকৃত হিসাব কেউ রাখে না। যে হিসাব রাখা হয় তা প্রকৃত হিসাবের ধারেকাছ দিয়েও যায় না। আমার মতে, এ দেশের পচানব্বই পারসেন্ট নারী কোনো না কোনোভাবে পুরুষের হাতে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

কিশোরী অবস্থায়ই ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি। এর কারণ পিতা মাতার অসচেতনতা ও অদূরদর্শিতা।

আমাদের বাসায় দীর্ঘ দিন যাবৎ সাবলেটে পয়ত্রিশোর্ধ অবিবাহিত ভদ্রলোক (মা বাবার মতে) থাকেন। পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। সকলেই তার প্রশংসা করেন। আমি তাকে আংকল বলে ডাকি। তিনি আমাদের পরিবারের মতোই একজন।

আমি শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করেছি। ক্লাস টেনে পড়ি। আংকলের চাহনি এখন আর আমার কাছে ভালো লাগে না। ইশারা-ইঙ্গিতে কি যেন বলতে চান। তাই একদিন মাকে বললাম, মা, আমি এখন বড় হয়েছি, রুমটা এখন আমার দরকার। তুমি আংকলকে বাসা ছেড়ে দিতে বলো।

মা বললেন, দেখো, এ জগতে এতো ভালো মানুষ পাওয়া দুষ্কর। বেচারি যতোদিনে স্বেচ্ছায় বাসা না ছাড়ে ততোদিন আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

আমার কথা মাকে বোঝাতেও পারলাম না এবং তিনি যে ভালো লোক নন সেটা বিশ্বাস করাতেও পারলাম না। উল্টো আমাকেই ধমক খেতে হলো।

সব কিছু মুখ বুজে সয়ে গেলাম।

আব্বা অফিসে আর ছোট ভাইকে নিয়ে মা স্কুলে যান। আমি আর আংকল প্রায়ই বাসায় থাকি।

একদিন আংকল জোর করে আমাকে তার আয়ত্তে নিলেন। আমার সমস্ত নারী শক্তির পরাজয় ঘটলো তার পুরুষ শক্তির কাছে।

তারপর থেকে প্রায়ই আংকেল আমাকে তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে এবং মাঝে মধ্যে আমিও তার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হই। কারণ তার কাছে জিম্মি হয়ে গেছি। তার সঙ্গে আমার কিছু অশ্লীল ছবি তিনি কিভাবে তুলেছেন তা জানি না। এখন এই ছবিগুলোই হচ্ছে তার হাতিয়ার।
যতোই দিন যাচ্ছে, আংকেল ততোই ভয়ংকর হয়ে উঠছেন। এখন বলছেন, আমি যদি তার কথা না শুনি তাহলে ভবিষ্যতে এর চেয়েও বেশি সর্বনাশ হবে। তার সঙ্গে নাকি আমার সারা জীবন সম্পর্ক রাখতে হবে। তারপর আমি যা হারিয়েছি তা নাকি আমার বিয়ের পর আমার স্বামী বুঝতে পারবে।
তাই একটি মানসিক যন্ত্রণা আমকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পড়ালেখায় মন বসে না। মা বাবার বকা শুনতে হয়। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় এ জীবন আর রাখবো না আত্মাহুতি দেবো। এছাড়া অন্য কোনো মুক্তির উপায় আছে কি?
অবশেষে কিশোরীদের প্রতি আমার অনুরোধ, তারা যেন দূরসম্পর্কীয় মামা, চাচা, খালু, ভাই, জ্ঞাতি কুটুম্ব এদের কাছ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। যাদের বাসায় কিশোরী মেয়ে রয়েছে তারা যেন সাবলেটে কোনো পুরুষকে (যতো ভালো হোক) ভাড়া না দেয়।
আমার মতো আর যাতে কোনো মেয়ের সর্বস্ব হারাতে না হয় সে জন্য এ সতর্কবাণী।

নাম ঠিকানাবিহীন
ঢাকা থেকে

মুখোশ

– আইনুল কবির সোহেল

তার সঙ্গে আমার পরিচয় একটা রাজনৈতিক সমাবেশে। সে ছিল বর্তমান বিরোধী দলের একটি বিশেষ এলাকার ছোটখাটো নেত্রী। তার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সে আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললো যেন অনেক দিন যাবৎ আমাকে চেনে। পরে বুঝেছিলাম মানুষকে প্রভাবিত করার এটি একটি কৌশল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, সমাবেশে তার সঙ্গী ছিলাম।
সে আমাদের দেশের অবহেলিত মানুষের কথা বলতো। রাজনৈতিক সমাবেশে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে বলতে কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে যেতো। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে কিভাবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা যায় সেসব কথাও বলতো তার বক্তৃতায়। তার মতো নেত্রীকে ভালোবাসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হতো। এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল।
এক সময় তার দল ক্ষমতায় এলো। কতো বড় বিস্ময় যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বুঝলাম এর কিছুদিন পরেই। সে যখন তার দলীয় ক্যাডার নিয়ে একটা বাড়ি দখল করলো অবৈধভাবে। তখন প্রথম ধাক্কা খেলাম। যে নেত্রী অবহেলিত মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বলে অশ্রুপাত করতো, ক্ষমতায় যাওয়ার পর তার মুখ থেকে তাদের সম্পর্কে একটি কথাও শুনিনি। এও সম্ভব!
একদিন তার সঙ্গী হয়ে দেখলাম কিভাবে অস্ত্রের জোরে চাদাবাজি করে। খুব মর্মাহত হয়েছিলাম সেদিন। একদিন নিরালায় তাকে অনেক বোঝালাম। বললাম যে, দরকার হলে সে রাজনীতি করা

ছেড়ে দিক। সৎভাবে আমরা যা উপার্জন করবো তাতেই আমরা ভবিষ্যতে সংসার সাজাবো। এতে হয়তো আমাদের অভাব থাকবে। কিন্তু এতে সুখ ও শান্তি আছে।
সে আমার এসব কোনো কথায় কান দিল না। আগের মতোই তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলো। ক্ষমতায় গিয়ে সে যেমন তার মহৎ রাজনৈতিক চিন্তাধারা হারিয়ে ফেললো তেমনি তার নেতৃত্বের অধঃপতনে তার প্রতি আমার ভালোবাসাও হারিয়ে গেল।

বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে

বালখিল্য

– শানু মজুমদার

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের চিলেকোঠায় পা রেখেছি। গ্রামের হাই স্কুলে পড়ি। পুরোপুরি গেয়ো। ভালোবাসা আমার কাছে তখন শরমের ব্যাপার। এরই মধ্যে মায়া নামে এক মেয়ের আবির্ভাব। বয়সের চেয়ে পরিপক্ব। শরীর–মনে দুদিকেই।
মায়ার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। একদিন জানালো সে আমাকে ভালোবাসে। কথাটা শুনে আমার দুই কান গরম হয়ে যায়। শিরদাড়া শির শির করতে থাকে। আবার ভালোও লাগে। যতোক্ষণ বাড়ি থাকি সে আমার কাছে কাছে থাকে। আমার সঙ্গের ছেলেরা এ নিয়ে বলাবলি করে। কেউ কেউ আবার আমাকে হিংসাও করতে থাকে।
এদের মধ্যে নিশু নামের ছেলেটির সঙ্গে আমার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল ইচড়ে পাকা। সুজাতার মায়ের সঙ্গে তার ভাব, পরে দৈহিক সম্পর্কও। নিশুর কাছ থেকে মজার মজার গল্প শুনি। সে আমাকে মায়ার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ার জন্য উৎসাহ দেয়। মাঝে মধ্যে আমিও উৎসাহী হই আবার হাটুও কাপে। বাপ রে, সবাই যদি জেনে যায়!
কিন্তু নিশুর ক্রমাগত টনিকে আমিও গোফে তেল দিই। বুকে থুথু দিয়ে একদিন সন্ধ্যায় মায়াকে নিয়ে এক বন্ধ ঘরে ঢুকি। ঘরটি ছিল আমাদের গরুর জন্য বরাদ্দ। সঙ্গত কারণেই সেখানে মৈথুন পর্ব সম্পাদনের জন্য আরামপ্রদ যুৎসই কোনো আসন ছিল না। তাছাড়া মায়াকে নিয়ে ঘরে ঢোকার পরেই কেন জানি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি।
ঘামতে শুরু করি।
এ সময় দরজা খুলে মায়ার দুলাভাই ঘরে ঢোকেন। তাকে দেখে অন্য দরজা দিয়ে দিই দৌড়। দুলামিয়া গজ গজ করে মায়াকে নিয়ে চলে যান।
বিষয়টি আমার পরিবারের সবাই জেনে যায়। আমি লজ্জায় মরি মরি অবস্থা। হে ধরণী, দ্বিধা হও।
ওই দিনই আমার আর মায়ার বালখিল্য ভালোবাসার কবর রচিত হয়। তারপর মায়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।
গত ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে শুনি আমাদের পাড়ার এক ছেলের সঙ্গে মায়ার মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেদিনের ক্লাস ফাইভে পড়ুয়া মায়া আজ শাশুড়ি। খবরটা শুনে সেই সন্ধ্যার বিব্রতকর দৃশ্যটা চোখের

সামনে দিব্যি ভেসে ওঠে। অথচ এরই মধ্যে কেটে গেছে কতো না ফুলেল বসন্তের দিন, কতো না হাড় কাপানো শীতের রজনী।

১৯৭৭ সালের ঘটনা। প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগের। সময় বদলিয়েছে। আমাদের মনমানসিকতাও পাল্টিয়েছে। এখন সব কিছু খোলামেলা। ভালোবাসা আজ আর শরমের বিষয় নয়। পরে আমার জীবনেও ভালোবাসা এসেছে। শিরিনকে ভালোবেসেই আমি বিয়ে করেছি।

কিন্তু আমার প্রথম বালখিল্য ভালোবাসার কাহিনীটা এতোদিন আমার বুকে চাপা ছিল। এটি আর গোপন রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না। তাই আজ লিখলাম।

ছাপা হলে আমার মেয়ে মাহিনও সেটি পড়বে হয়তো।

ওই দিন লজ্জায় চুপসে গেলেও আজ একটুও লজ্জা পাচ্ছি না। মাহিন পড়ে পড়ুক, পড়ুক সবাই।

ঢাকা থেকে

ভিন্ন ইশারা

– মোশারফ হোসেন সবুজ

আজ দুই বছর হলো সউদি এসেছি। দেখেছি এখানকার মেয়েদের ভালোবাসা প্রকাশ একটু ভিন্ন রকম। মাথায় কাপড়, গায়ে বোরখা দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। কথায় বলে, *উপরে ফিটফাট, নিচে সদরঘাট।*

আমি একটি ক্লিনিকে ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করি।

এক শুক্রবার বিকেল বেলা একজন সউদিয়ান মহিলা আমার ক্লিনিকে এলেন। তার দাতের ব্যথা। সঙ্গে এসেছে তার যুবতী দুটি মেয়ে। দাতের ডাক্তারের রুম দোতলার মধ্যে থাকাতে মহিলাটি দোতলায় উঠে গেলেন। আর মেয়ে দুটি নিচের তলায় মহিলাদের বসার রুমে বসে রইলো।

বসার রুমের সঙ্গে ছিল একটি বাথরুম এবং একটি খালি রুম। আমার বাথরুমে যাওয়ার দরকার হওয়ায় আমি ওই মেয়েদের পাশ কাটিয়ে বাথরুমে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি বাথরুমের দিকে এলো। আমি মনে করলাম, হয়তো বা তাদেরও প্রয়োজন বাথরুমে যাওয়ার। আমার কাজ সেরে যেই বাইরে এলাম অমনি দেখি একটি মেয়ে দরজার পাশে দাড়িয়ে আছে। সে দেখছে এদিকে কেউ আসে কি না। অন্য মেয়েটি ওই খালি রুমে দাড়িয়ে তার বোরখা তুলে আমাকে ডেকে আরবিতে বললো, বন্ধু, তুমি এ দুটো ধরো।

আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। যখন হুশ হলো তখনি মনে হলো, এ দেশের কঠিন আইন। আর চোখের সামনে ভেসে এলো বাংলাদেশে রেখে আশা আমার বৌটির কথা।

আমি সউদিয়ান মেয়েটির ভিন্ন রকম ভালোবাসায় সাড়া দিতে পারলাম না। চলে গেলাম সেখান থেকে।

এখানে যারা চাকরি করতে এসেছেন তারা হয়তো এ রকম বহু অফার পেয়েছেন, হয়তো আরো পাবেন। আর পেলেই আমার মতো মনে করবেন বাংলাদেশে রেখে আসা বৌ, বাচ্চার কথা। দেখবেন ও রকম ভিন্ন ভালোবাসার ইশারায় সাড়া দেয়ার কোনো দরকারই হবে না।

রিয়াদ থেকে

আত্মসমর্পণ

– মোহম্মদ মাহমুদুল হাসান

সকালের ক্যাম্পাস। হালকা শিশির পড়েছে। ঠাণ্ডা আরামদায়ক বাতাস বইছে। সোনালি রোদ শিশিরের ওপর পড়ে মুক্তার মতো ঝলকাচ্ছে। মনে একটা খুশির হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। ক্লাসে গেলাম। একটানা ক্লাস করে একটায় ছাড়া পেলাম। বাইরে বের হচ্ছি এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকলো। পেছনে ফিরলাম। দেখলাম সুজানা আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

এই, খুব ব্যস্ত নাকি? চলে যাচ্ছিস যে। সুজানা বললো।

হ্যা কিছুটা। শহরে সামান্য কাজ আছে। তা তোর খবর কি? বললাম আমি।

আজ বিকেলে আমায় কিছুটা সময় দিতে পারবি?

ইতস্তত করে বললাম, কাজটা যেহেতু তোর, সময় না দিয়ে পারি?

সুজানা বললো, আজ বিকাল চারটায় হলে আয়। সময় মতো আসিস কিন্তু।

বিকেলে রোকেয়া হলে গেলাম। সুজানাকে কল দিলাম। ঠোটে হালকা লাল লিপস্টিক, কপালে একটা ছোট্ট লাল টিপ, নীল শাড়ি পরে সুজানা এলো।

দারুণ সুন্দর লাগছে আজ সুজানাকে। মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে কোনো দেবী পৃথিবীতে নেমে এসেছে আর আমিই তাকে প্রথম দেখছি। তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছি না।

সুজানা, তুই এতো সেজেছিস কেন! এনিথিং স্পেশাল?

কোনো জবাব দিল না সে।

বললাম, কোথায় যাবি?

সুজানা একটা রিকশা ডাকলো। পাশাপাশি দুজনে বসলাম। রিকশা চলতে লাগলো। ইবলিশ চত্বর, প্যারিস রোড পেরিয়ে আমরা মেইন রোডে পড়লাম।

হালকা বাতাসে তার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ছে এদিক-সেদিক। চুল ঠিক করতে করতে সুজানা বললো, আজকে তোর জন্য দারুণ একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে।

তা সারপ্রাইজটা কি? বলে দে না।

এখন না মাই ফ্রেন্ড। সময় হলেই তুই তা পাবি।

ভদ্রা পার্কের গেটে রিকশা দাড়ালো। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। একটা নির্জন জায়গায় বসলাম। খুব কাছাকাছি চুপচাপ বসে আছি। একটা দোয়েল গাছ থেকে উড়ে গেল। এক অজানা ভালোলাগায় সময় চলে যেতে লাগলো।

সুজানা বললো, রাইন! আজ আমার জন্মদিন। কি খুশি হয়েছিস না।

আজ তোর জন্মদিন। আমায় বলিসনি কেন? তুই আমায় বন্ধু মনে করিস না। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। চুপচাপ বসে আছি আমি।

রাইন, মাই ফ্রেন্ড! আমায় ভুল বুঝিস না। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আসলে তোকে সারপ্রাইজ দেবো বলেই আগে বলিনি।

রাইন, তুই কোনো কথায় বলছিস না। আমার একটা কথা রাখবি।

রাখার মতো হলে অবশ্যই রাখবো।

আমি তাকালাম তার দিকে সে যেন কি বলতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। অভয় দিলাম। দেখলাম তার ঠোট কাপছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

রাইন, আমি তোকে ভালোবাসি। আমি তোকে সারা জীবনের জন্যে চাই। তোকে ছাড়া আমি বাচবো না। প্লিজ, আমায় ভুল বুঝিস না। সুজানা বললো।

স্থির চোখে আমায় দেখছে সে। কপালে ভাজ পড়েছে। মুখের অভিব্যক্তিতে আমাকে কি যেন অনুরোধ করছে। না, পারলাম না তাকে অ্যাভয়েড করতে। বলে ফেললাম, সুজানা, আমিও তোকে ভালোবাসি।

সুজানা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে। মুখে মৃদু হাসি, ঠোট দুটো কিছুটা খোলা, বড় বড় চোখ দুটোর দৃষ্টি সরাসরি আমার দিকে।

আমায় জড়িয়ে ধরলো সে। একটা কোমল সূক্ষ্ম আবেগ, অনুরাগ, স্থির, অচঞ্চল, দীপ্তি জেগে উঠলো। আমাদের মাঝে যেন ফুঠে উঠলো অলৌকিক কোনো ফুল।

আমার ঠোটের দিকে এগিয়ে এলো তার ঠোট।

আমার চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি রেখে তাকালো তার উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এলো তারা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে...।

রাজশাহী থেকে

বোরখাবুড়ি

– নাছিম

মহাখালি বাস টার্মিনালে ময়মনসিংহগামী এক বাসে উঠলাম। ইচ্ছা ছিল ড্রাইভারের ঠিক পেছনে সিট নেয়া। দেখলাম মধ্য বয়স্ক এক মহিলা আর এক কিশোর ছেলে বসা। আমি হতাশ হয়ে পেছনের এক সিটে বসলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখি ছেলেটি নেই। মহিলা একা। জিজ্ঞাসা করলাম তিনি একা কি না। খালি পেয়ে অনুমতি নিয়ে বসলাম।

অনেকক্ষণ পর আলাপ শুরু করলাম। সেখানে একজন অল্প বয়স্ক মহিলা থাকলে অবশ্য আমি বসতামই না। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করার এক পর্যায়ে তিনি জানতে চাইলেন, ময়মনসিংহে পৌছে টিভিতে সিনেমা দেখতে পারবেন কি না।

সেদিন ছিল শুক্রবার।

আমি তার বয়সের কথা চিন্তা করে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সিনেমা দেখেন?

আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, সিনেমা হলে গিয়েও তিনি দেখেন। মেয়েরা বড় হয়েছে, তাই সবার চোখ ফাকি দিয়ে বোরখা পরেই হলে ঢোকেন একা।

সেদিন বাসেও তিনি ছিলেন বোরখা পরিহিতা এবং বাড়তি একটা ওড়না পরা।

আরো বললেন, ওসবও দেখেছি তিনবার।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি দেখেছেন?

বললেন, বি.এফ।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এসব কোথায় দেখেন?

বাসায়ই ভি.সি.ডি আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথম কবে দেখলেন।

বললেন, একবার ত্রিশালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাতে আমরা তিন বান্ধবী বাইরে বেড়াতে গিয়েছি। হঠাৎ দেখি এক দোকানে ওসব চালাচ্ছে। আমরা একটু দেখেই চলে এলাম। তার নাকি এক ভাতিজা আছে। সে-ই তার জন্য সিডি নিয়ে আসে। তার নাকি এসব দেখতে ভালোই লাগে।

এক পর্যায়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাকে আমার ভালো লাগছে কি না।

বললাম, হ্যা।

তিনি বললেন, তাহলে তো এখানে গাড়িতে কিছু করা সম্ভব নয়। ময়মনসিংহে গিয়ে কোনো হোটেলে গিয়ে...। আরো বললেন, প্রতি সপ্তাহে যেন একবার করে...। শুক্রবারে এসব করা ঠিক হবে না, তাই ঠিক করলেন, প্রতি বৃহস্পতিবারে যেন আমরা...। তার স্বামী নাকি তাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু সে ভালোবাসে না স্বামীকে।

ইতিমধ্যে মহিলা আমার ডান উরুতে হাত রেখে ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলেন। কিছুক্ষণ পর উরুতে চিমটি কাটতে লাগলেন। এরপর বললেন, কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বললাম, এতোদিন জানতাম ছেলেরাই হারে, মেয়েরাও হারে?

তার যে বয়স, মনে হলো এ বয়সে টাকার বিনিময়ে তাকে কেউ পছন্দ করবে না। ভাবলাম হয়তো নিছক দৈহিক চাহিদার জন্য আমার মতো কম বয়সী একজনকে খুজছে।

গাড়ি ময়মনসিংহে এসে পৌছালো। গাড়িতে বসেই তিনি আমাকে বললেন, তাকে যেন দুপুরের খাবার খাওয়াই।

নিয়ে গেলাম হোটেলে।

হোটেলে যাওয়ার পর বললেন, খাওয়াতে হবে না, বাসায় গিয়েই খাবেন।

এরপর চাইলেন টাকা।

বুঝলাম টাকা যেহেতু চাইলো কাজেই সে কমার্শিয়াল। তাই ফাকি মেরে চলে এলাম। বুঝতে পারলাম না আর কতোভাবে সে খদ্দের ম্যানেজ করে। বুদ্ধিদীপ্ত এক প্রতারক মহিলা যার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে রাস্তার দুই ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখা হলো না।

ময়মনসিংহ থেকে

কি ?

– সাজ্জাদ আলম

পৃথিবীর অনেকগুলো আশ্চর্যতম শব্দের মধ্যে ভালোবাসা অন্যতম। ভালোবাসাই একমাত্র শব্দ যা সবার মনের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে। ভালোবাসা না মানে কোনো নিয়ম, না মানে কোনো নীতি, চলে তার স্বাভাবিক গতিতে। তবুও এ সম্পর্কে লেখালেখি, বলাবলি কম হয়নি। ভালোবাসা নিয়ে লেখালেখি করতে করতে কেউ হয়েছেন কবি, থিসিস করে কেউ হয়েছেন বিশ্বপ্রেমিক। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেননি ভালোবাসা কি? নির্ধারণ করতে পারেননি এর পরিসীমা। এই আশ্চর্যতম শব্দের পিছে আদাজল খেয়ে লেগে উদঘাটন করেছি এর রহস্য, ছিন্ন করেছি মায়াজাল এবং অবশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

এক. যার সব কিছু ভাসা ভাসা তার নাম ভালোবাসা।

দুই. হিমু হওয়ার চিন্তা–ভাবনার নাম ভালোবাসা।

তিন. এটা এক ধরনের ভাইরাস যা হার্ট ডিস্কে অ্যাটাক করে।

চার. নারী পুরুষের ঐতিহাসিক ইয়ে...।

পাচ. মধুময় ছাত্র জীবনকে যা বিষময় করে।

ছয়. ভালোবাসা হচ্ছে নতুন নতুন আদুভাই তৈরির কারখানা।

সাত. সুন্দরী রমণীদের দেমাকের নাম ভালোবাসা।

আট. যে কারণে নারী শরমে মরে তাই ভালোবাসা।

নয়. যা সুচ হয়ে ঘরে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়।

দশ. এরশাদ যা করে।

এগারো. হার্ট চলার জ্বালানির নাম ভালোবাসা।

বারো. ফুল ছোড়ার পর হাই হিলের বাড়ি তারপর... সেটাই ভালোবাসা।

তেরো. ভালোবাসা শীতের অতিথি পাখি।

চোদ্দ. যা লাইফের স্ট্যাম্প উপড়ে ফেলে তাই ভালোবাসা।

পনেরো. এটা এক ধরনের মানসিক রোগ।

ষোল. এটা এক প্রকার জীবন নাটক যা কখনো শেষ হয় না।

সতেরো. ভালোবাসা উন্নতমানের দিল্লিকা লাড্ডু।

আঠারো. লোড শেডিংয়ের মধ্যে প্রেমিক–প্রেমিকার ইয়া ইয়া... ই ভালোবাসা।

উনিশ. জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নাম ভালোবাসা।

বিশ. ভালোবাসা এক ধরনের শিং মাছ যা ধরতে গেলেই কাটা খাবে।

একুশ. যার পেছনে ছেলেরা ছোটে আর ছোটে তার নাম ভালোবাসা।

বাইশ. ভালোবাসা হচ্ছে চোরাবালি পা দিলেই কুপোকাত।

তেইশ. লাইলি–মজনু, রোমিও–জুলিয়েটের ইটিস–পিটিসই ভালোবাসা।

চব্বিশ. ছ্যাকার জাতভাইয়ের নাম ভালোবাসা।

পচিশ. ভালোবাসা হচ্ছে অষ্টম দোজখ।

ছাব্বিশ. মনের ভাব প্রকাশের নাম ভালোবাসা।

সাতাশ. ভালোবাসা হচ্ছে ছ্যাকামাইসিনের আগের অবস্থা।

আটাশ. যা কাছে টানে না, গাছেও তোলে তার নাম ভালোবাসা।

ঊনত্রিশ. ভালোবাসা হচ্ছে তৈলাক্ত বাশ বেয়ে বানরের উপরে ওঠার চেষ্টা।

ত্রিশ. ভালোবাসা হচ্ছে জিলাপির প্যাচ।

একত্রিশ. ভালোবাসা হলো জটিল যৌগ যার আকার–আকৃতি নির্ধারণ অসম্ভব।

বত্রিশ. প্রেমিকার ছোড়া মিসাইলের নাম ভালোবাসা।

চৌড়হাস, কুষ্টিয়া থেকে

চেষ্টা

– তনয়া

ওকে আমিই প্রথম বলেছি ভালোবাসি। ওর কাছে যখনই উত্তর জানতে চেয়েছি তখন নীরব থাকতো। বিভিন্ন কথা বলে ও অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতো। আমি ওর মনের কথা জানতে পারতাম না। মাঝে মধ্যে ও এমন আচরণ করতো, মনে হতো সত্যিই ও আমাকে ভালোবাসে। ওর আচরণগুলো ছিল অদ্ভুত রকমের পরিবর্তনশীল।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে ওকে পাগলের মতো ভালোবেসেছি। ভাবতেও পারিনি ও অন্য মেয়ের প্রতি দুর্বল। যখন জানতে পারলাম তখন আর নিজেকে ফিরিয়ে নিতে পারিনি। তারপরও ওকে আমি ভালোবেসেছি। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখেছি যে, আমার ভালোবাসা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে ওকে অবশ্যই পাবো।

তবে আমার কাছে দৈহিক ভালোবাসার কোনো দাম নেই। শারীরিক ভালোবাসাকে সব সময় ঘৃণা করেছি। মনকে প্রাধান্য দিয়েছি সব সময়। তাই আমাদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ও কখনো আমার দুর্বলতার সুযোগ নেয়নি।

ও আর দশটা ছেলের মতো ছিল না। তাই ওকে ভালোলাগতো। ওর সব কিছুই আমার ভালো লাগতো। ওর হাসি, ওর চোখ, ওর কথা বলার আর্ট অসম্ভব সুন্দর। ও এতো সুন্দর করে কিভাবে যে

হাসতো তা আমার কাছে শেখার একটা ব্যাপার বলেই মনে হতো। চেষ্টা করতাম সুন্দর করে হাসতে, কথা বলতে। ওর ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করতাম।

আমি দেখতে মোটেই সুন্দর ছিলাম না। কিন্তু ও কখনো আমাকে সে কথা বলেনি। আমার অসুন্দরতা নিয়ে উপহাস করেনি। ও সব সময়ই আমার প্রশংসা করতো।

আমি জানি, ও আমাকে পছন্দ না করলেও আমার ভালোবাসাকে সব সময় শ্রদ্ধা করতো, আমার মনের সব কথা জানতো এবং প্রশংসা করতো আমার সুন্দর মন-মানসিকতার জন্য। আমাকে ও অশ্রদ্ধা করেনি কখনো।

তাই ওকে আমি পেতে চাই নিজের করে। তবে জোর করে নয়, ভালোবাসা দিয়ে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

স্মৃতির কঙ্কাল

– মামুন

আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে যখন আমার জন্ম তখন বাবার বন্ধু আজগর খান বাবাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন দোস্ত, এরপর আমার কোনো মেয়ে হলে তোর এই ছেলেকে আমি জামাই করবো।

এ ঠাট্টাই আমার জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে দুই বছর পর সত্যিই আজগর খানের স্ত্রীর কোল জুড়ে জন্ম নেয় একটি ফুটফুটে মেয়ে। এ মেয়েটিই আমার জীবনের মধ্যমণি রোকসানা।

রোকসানার জন্মের পর থেকেই আজগর খান এবং তার স্ত্রী নাকি আমাকে জামাই বলে ডাকতে শুরু করে এবং এই ধারা অব্যাহত রাখে রোকসানার সঙ্গে আমার চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত।

পূর্ণ জ্ঞান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমিও নাকি তাকে বৌ বলে ডাকতাম। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চলতো খুব হাসি-তামাশা।

ছোট থেকেই আমার মধ্যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে, রোকসানা আমার এবং চিরজনমের জন্যই আমার। হয়তো রোকসানার মধ্যেও। আমরা একে অপরের ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলাম। কোনো কিছু না বুঝলেও একে অপরের সান্নিধ্যের মধ্যে একটা অপার আনন্দ খুজে পেতাম। হয়তো এ জন্যই আমার কোনো ছেলে বন্ধু গড়ে ওঠেনি।

এভাবেই আমরা বড় হতে থাকি। যে বয়সে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা কল্পনাই করতে পারে না সেই বয়সে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয় সেই আদিমতম সম্পর্কটিও। এভাবেই আমাদের জীবনের সরল রৈখিক পথচলা। কিন্তু জীবনের গতি তো আর আলোর গতি নয় যে, সব সময় সরলরেখায় চলবে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটলো তাই।

আমি ভালোভাবে এসএসসি পাস করে ভর্তি হলাম শহরের কলেজে। রোকসানা তখন ক্লাস এইটে। রোকসানার বাবা তার পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে মেয়ের বিয়ে দিতে তৎপর হলেন। বাবাকে

বললেন। তার পূর্ব ইচ্ছার কথা। কিন্তু বাবা তার বৃলিয়ান্ট ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। রোকসানার বাবা জেদ করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন অন্য জায়গায়।
ছয় মাস পরে বাড়ি এসে এ খবর শোনার পর আমার পুরো দেহে বয়ে যায় একটা হিম শীতল প্রবাহ। নিজেকে মনে হলো প্যারালাইজড রোগী। আমি বিস্ময়ে হতবাক। সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে যায়। এক বছর উদভ্রান্তের মতো জীবন কাটাই।
মায়ের সেবা এবং মমতাময়ী সান্নিধ্য আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি বটে কিন্তু হৃদয়ের সেই রক্তক্ষরণটা থামেনি আজও।
আমি ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে চাকরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। রোকসানা ইতিমধ্যেই চার সন্তানের জননী। বড় মেয়ে নাকি এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। সংসারের ভারে নুয়ে পড়েছে। দেখলে মনে হয় অস্থি–চর্মসার মধ্যবয়সী মহিলা। কালে ভদ্রে দেখা হলে মুখ ঢেকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।
কিন্তু রোকসানা এখনো আমার আদি এবং অন্ত। অন্য কোনো মেয়ের কথা ভাবতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে রোকসানার সেই কিশোরী মুখটি। পুরোটা জীবন হয়তো একাকী কৈশোরের সেই স্মৃতির কঙ্কাল বয়ে বেড়াতে হবে।
সকল অভিভাবকের প্রতি অনুরোধ, শিশুদের নিজের মতো করে বড় হতে দিন। তাদের ওপর অন্য কোনো চিন্তা চাপিয়ে দেবেন না।

ময়মনসিংহ থেকে

একাকী

– নীলিমা রহমান

পূর্ণিমার রাত। চাদে যেন আগুন লেগেছে। আকাশের তারাগুলো যেন নিজকে জাহির করতে বেশি ঝকমকে। চাদের রূপের কাছে তারা ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু আমার আকাশের সৌন্দর্যের কাছে সব কিছু নিষ্প্রভ। তবে পুরো পৃথিবীতে আলোর ঢেউ থাকলেও শুধু আমার চোখেই এখন জল।
আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন আমি আর আকাশ ছোট ছিলাম। আকাশ আমার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, সহপাঠী তথা আজ আমার চোখের জল। আমাদের মধ্যেকার মিল দেখে সবাই *মানিকজোড়* বলতো। এভাবে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা ফেললাম। কেউ কাউকে না বললেও চোখের দৃষ্টিতে দুজনের মন চুরি হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারিনি। নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও সরাসরি কেউ কিছু বলিনি। হঠাৎ করেই বাবার বদলি হয়ে ঢাকা চলে এলাম। প্রতি সপ্তাহেই আকাশের চিঠি পেতাম। সে তখন খুলনায় ছিল।
আজ কয়েক বছর পেরিয়ে গেছে। জীবনের সব স্মৃতির ধুলায় আচ্ছন্ন হলেও আকাশ তার সব কিছু নিয়ে আজো উজ্জ্বল।
কয়েক বছর আগে আমার আঠারোতম জন্মদিনে তারই অনুরোধে আকাশনীল শাড়ি পরেছিলাম। কিন্তু সে পাশে ছিল না। কারণ আমার মতো তারও সেদিন বিশেষ দিন ছিল। সে যেন সন্ধ্যাতারার

মতো আমার সঙ্গ দিচ্ছিল, নীলাভ গগনে তাকিয়ে বলেছিলাম, এসো, তুমি এসো। দেখো, তোমার প্রিয় শাড়িই পরেছি। তুমি কোথায়? অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বলেই ভেঙে পড়েছিলাম।

কারণ আমার জন্মদিনের উপহার কিনতে গিয়েই সে সন্ত্রাসীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। যে বুকে ছিল আমার জন্য ভালোবাসা সে হৃদয়ে ছিল দুটি তপ্ত বুলেট। শেষ সময়ে তার কথা ছিল তার মায়ের সঙ্গে। সে বলেছিল, আমি যেন আঠারোতম জন্মদিনে নীল শাড়ি পরি। তাহলে যদি সে পাশে নাও থাকে তারপরও নীল আকাশের সন্ধ্যাতারার আলো হয়ে সে আমার পাশে থাকবে। যেন সেই জন্মদিনে আমি না কাদি তা ছিল তার অনুরোধ।

আমার আঠারোতম জন্মদিন ও তার মৃত্যুদিন একই দিন, এরপর থেকে আমার জন্মদিন হয়নি, হয়েছে তার মৃত্যুদিন।

আমি তার মৃত্যুবার্ষিকীতে কাদতে চাই না। কিন্তু অশ্রু সাগর বাধ মানে না। আমার হৃদয়ে জমে যাওয়া ভালোবাসা দুঃখের উত্তাপে গলে পড়ে চোখ দিয়ে।

আজও আমি একা। মহাপ্লাবনের মতো কান্না দুচোখ জুড়ে। সব কিছু ম্লান হয়ে গেলেও আছে শুধু আকাশ আর আমার ভালোবাসা। কেউ কি উত্তর দিতে পারে কেন আমার চোখে অশ্রু, কেন আমি একাকী? এ প্রশ্ন সমাজের কাছে রইলো।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

মা

– ফারজানা তৈয়ূব শিল্পী

পোস্ট অপারেটিভ রুমে আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে দিয়ে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। ওষুধ আর ফিনাইলের গন্ধে প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগলো আমার। তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। ডাক্তার এসে আবার ইনজেকশন দিলেন হাতে ব্যথা পেলাম বলে মনে হলো না। প্যাথেড্রনের ঘোর এখনো কাটেনি। দুই হাত বন্ধ স্যালাইনের জন্য।

হাসির শব্দ পেলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে কথা বলতে পারলাম না। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অস্ফুট শব্দ করলাম পানি, পানি। কেউ শুনলো বলে মনে হলো না। আবার বললাম, পানি।

এবার জুতার শব্দ পেলাম। পুরুষ কণ্ঠে কেউ বলে উঠলো, কি হয়েছে বড়আপু?

গলাটা চেনা চেনা লাগলো। কিন্তু মনে করতে পারলাম না। বললাম, পানি খাবো।

পুরুষ কণ্ঠ বলে উঠলো, পানি দেয়ার তো নিয়ম নেই। ঠিক আছে তুলা দিয়ে তোমার ঠোট ভিজিয়ে দিচ্ছি। একটু পরে তুলা দিয়ে মুখে কয়েক ফোটা পানি দিল।

এবার চোখ মেলে তাকালাম। দেখি আমার ডাক্তার ভাইয়া দাড়িয়ে আছেন। বুঝতে পারলাম পুরুষ কণ্ঠটি তার এবং তিনিই আমাকে তুলা দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে দিয়েছেন।

ভাইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কেমন লাগছে।

বললাম, একটু ভালো। আবার চোখ বন্ধ করলাম। তলপেটে চিনচিনে ব্যথাটা এখনো আছে।

আম্মা এলেন। একটু পরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, তোর ছেলে হয়েছে।

আম্মার চিৎকারে বিরক্ত লাগলো। বললাম, আহ, আস্তে বলো। এতো জোরে কথা বললে মাথায় লাগে।

একটু পরে আমার ছোট বোন শম্পাকে দেখা গেল। কোলে মনে হলো আমার ছেলে। মুখ দেখা গেল না, তুলা দিয়ে পেচিয়ে রাখা হয়েছে। শম্পাকে ইশারায় ডাকলাম কাছে আসতে। বললাম, বাবুকে দেখবো। তুলার ভেতর ছোট্ট একটা কচি মুখ দেখা গেল, মনে হলো দেবশিশু। পরম নিশ্চিন্তে তুলার ভেতরে ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম, এতো ভালো লাগলো যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কতো কথা যে এক সঙ্গে মনে এলো কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু অপলক চোখে শিশুটিকে দেখতে লাগলাম। চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। কোলে নিতে চাইলাম। কিন্তু ব্যথার জন্য নিতে পারলাম না।

মা হওয়ার আনন্দে নয় মাসের অপরিসীম কষ্টের কথা এক মুহূর্তে ভুলে গেলাম। বাচ্চার বাবাকে দেখা গেল একটু পরে মুখে একটা সুখী সুখী ভাব নিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন।

কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ থেকে

সুখী

– উম্মে হাবিবা

দাদু ডেকে বললেন, মানিক তোর স্বামী।

আমি বললাম, মানিকভাই আমার স্বামী!

দাদু বললেন, মানিকভাই বলবি না, শুধু মানিক।

দাদু যখন এই কথা বলেছিলেন তখন আমার বয়স আট বছর আর মানিকের বয়স বারো বছর। দাদুর কথায় আমি খুশি হয়েছিলাম। কারণ মানিক আমাকে খুব আদর করতো।

এরপর থেকে মানিকভাইকে শুধু মানিক বলে ডাকতাম। আর মানিক আমাকে বৌ বলে ডাকতো। মানিক আমার বড় ফুপুর ছেলে। ফুপুও আমাকে বৌমা বলে ডাকতেন। খেলার সঙ্গীরাও আমাকে মানিকের বৌ বলতো। বাড়ির সবাই আমাকে ও মানিককে নিয়ে হাসাহাসি করতো। যখন ফুপুর বাড়িতে যেতাম, নতুন কেউ এলে ফুপু তাদের বলতেন, এটা আমার মানিকের বৌ।

আমি তখন লজ্জায় লাল হয়ে যেতাম।

এভাবেই আমার দিন কাটছিল। একদিন সব ফুপুরা এসেছেন, কিন্তু মানিককে কোথাও খুজে পেলাম না। তখন বড় ফুফুর কাছে জানতে চাইলাম মানিক আসেনি।

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ফুপু বললেন, মানিক তো পান্নাকে বিয়ে করবে তাই পান্নার সঙ্গে পুকুর ঘাটে গেছে।

ফুপুর কথা শুনে আমি কান্না শুরু করে দিলাম।

তখন বড় ফুপু বললেন, তোমার ছোট ফুপু মিথ্যা কথা বলেছে, এমন সুন্দর বৌ রেখে কি পান্নাকে মানিক বিয়ে করবে?

পান্না আমার ছোট বোন। সবাই যখন আমার কারণ জানলো তখন সবাই হেসে দিল। সবার হাসি দেখে আমার লজ্জা করছিল বলে আরো জোরে কান্না আরম্ভ করলাম।

বড় হচ্ছিলাম আর মানিককে আরো বেশি ভালোবাসতে লাগলাম। মানিকও আমাকে খুব ভালোবাসতো। মানিক যখন আমাদের বাড়িতে আসতো তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুইজন কথা বলতাম আর দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তবু মন বলতো, তার সঙ্গে আরো কথা বলি তাকে আরো দেখি। মানিকের অবস্থাও ছিল আমার মতো।

আমি যখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী তখন আমাদের সঙ্গে ফুপুর জমি নিয়ে ঝগড়া বাধে। বাড়ি থেকে আমার ওপর হুকুম করা হলো মানিকের সঙ্গে কথা বলা যাবে না, দেখা করা যাবে না। বাড়ির সবাই বদলে গেল। যে দাদু প্রথম আমার চোখে মানিককে স্বপ্ন একে দিয়েছিলেন সেই দাদু বললে মানিককে ভুলে যেতে। আমার কান্না ছাড়া উপায় ছিল না।

কয়েকদিন পর কলেজে যাওয়ার পথে দেখলাম মানিক দাড়িয়ে আছে। তার মুখটা মলিন দেখাচ্ছিল। তার সঙ্গে খুব কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে ছিল পান্না। এভাবে আমাদের দেখা হচ্ছিল। কিন্তু কথা বলতে পারতাম না।

একদিন কলেজে যাওয়ার পর আমার বান্ধবী অনু আমার কাছে ছুটে এসে বললো, কাল মানিকভাই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। বেচারা খুব কান্নাকাটি করলো তোর জন্য। আর তোকে এই চিঠিটা দিয়েছে। চিঠিতে মানিক লিখেছিল –

হীরা,

তুমি জানো, আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি। আমি পৃথিবীর কিছুই চাই না। শুধু তোমাকে চাই। তোমার যদি মত থাকে তাহলে বাবা মায়ের মতামত ছাড়াই তোমাকে বিয়ে করতে চাই। যদি সম্ভব হয় কাল আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি কলেজে আসবো।

ইতি – মানিক

সারা রাত মানিকের কথা ভাবলাম। যতোবার ভাবি ততোবার বাবামায়ের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বাবা মায়ের ভালোবাসার কাছে হেরে গেল আমার ভালোবাসা। না, আমি পারবো না বাবা মায়ের মুখে চুনকালি দিতে। পরদিন ক্লাস শেষে মানিকের সঙ্গে দেখা করলাম। মানিককে জানালাম, বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করতে আমি পারবো না। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন আমার চাচা আমাদের দেখে ফেলেন।

বাড়িতে গিয়ে আব্বার কাছে চাচা বলে দিলেন। মাকে আব্বা বললেন আমাকে ঘরে আটকিয়ে রাখতে। মা আমাকে ঘরে আটকিয়ে রাখলেন। বিকেলে মামা–মামি এলেন, সঙ্গে অমিতভাই। অমিত আমার মামার ছেলে। ওই রাতে অমিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

বাসর ঘরে অমিত আমাকে বললো, হীরা, তুমি যদি মানিককে কাছে যেতে চাও তাহলে যাও। আমি কোনো বাধা দেবো না।

বললাম, আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার কাছেই থাকবো।

তখন আমার হাতে একটা গোলাপ দিয়ে অমিত বললো, জানো, আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস! আমাদের কি সৌভাগ্য, আজ আমাদের বিয়ে হলো।

তখন আমার মনে হলো, সত্যিই তো, আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি! মানিকই আমাকে প্রথম বলেছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসের কথা।

সামনের ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আমাদের বিয়ের তিন বছর হবে। মানিককে ছাড়া আমি অসুখী নই। আমি খুব সুখে আছি। অমিত আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার শ্বশুর-শাশুড়িও আমাকে আদর করেন। শুধু আমার ননদের মনটা জয় করতে পারিনি। তবু চেষ্টায় আছি তার মন জয় করার জন্য। অমিত খুব ভালো। তার মতো স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা। প্রতি বিয়ে বার্ষিকীতে আমরা বেড়াতে যাই। ওই দিন শুধু আমার আর অমিতের। সামনের ১৪ ফেব্রুয়ারি, মানে আমাদের বিয়ে বার্ষিকীতে নতুন কোনো জায়গায় বেড়াতে যাবো।

আর মানিক? সে আমার ছোট বোন পান্নাকে বিয়ে করেছে। ছোট ফুপুর কথা সত্যি হয়েছে। এখন ফুপুর সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ভালো। আসলে আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

মির্জাপুর থেকে